চ তু র্থ অ ধ্যা য় আধিপত্যের উনিশ শতকীয় রাজনৈতিক সংঘাত : মান্য বনাম অপর

ক্ষমতা সর্বব্যাপ্ত, বলেছিলেন তাত্ত্বিক মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ)। কিন্তু মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আর কার্যপ্রণালীর মধ্যে এমন স্বতঃসিদ্ধতায় সেই ক্ষমতার বীজ আত্মগোপন করে থাকে যে সহজে বোঝা যায় না তার মধ্যে নিহিত আছে নির্মম আধিপত্যের ভাষা, বিরুদ্ধ অস্তিত্বকে ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলবার ভাষা, তাকে বিধবস্ত করে দেওয়ার ভাষা। বাচন-প্রতিবাচনের দ্বান্দ্বিকতায় অসামান্য কৌশলে তা মন আর মস্তিক্ষের দখল নেওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে থাকে। এই ক্ষমতা বা প্রতাপই যে জ্ঞানের উৎপাদক ও নিয়ন্তা, ফুকোর অভিমত এমনটাই। সুতরাং জ্ঞান আর ক্ষমতা পরস্পরের পরিপূরক। আর আলোকপ্রাপ্তির সূত্র ধরে যে জ্ঞানচর্চা তা নিঃসন্দেহে ক্ষমতা-বিস্তারেরই বিকল্প ভাষ্য। তাঁর কথায়:

'জ্ঞান ও প্রতাপ প্রত্যক্ষভাবে পরস্পরকে দ্যোতিত করে এবং এমন কোনও প্রতাপ-সম্পর্ক সমাজে হতেই পারে না যা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান-প্রস্থানকে সংগঠিত করে না।'

ফুকো বারবার দেখিয়েছেন প্রতাপের কৃৎকৌশল এবং পরিণতি। তাঁর মতে :

'সমাজদেহের সমগ্রতায় প্রতাপ-সংশ্লিষ্ট সম্পর্কগুলি সক্রিয়। এরা অজস্র এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণের মধ্যে ব্যক্ত হয়ে থাকে।'^২ পীড়নকামী আধিপত্যবর্গ নানা পদ্ধতিতে অবদমনের শিকল পরাতে চায় অসহায়

পাড়নকামী আধিপত্যবর্গ নানা পদ্ধতিতে অবদমনের শিকল পরাতে চায় অসহায় শোষিতদের পায়ে। তাদের জীবনকে সূক্ষ্ম-স্থূল, দৃশ্য-অদৃশ্য প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অবদমিত করাই প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্যবাদী বর্গের অন্যতম লক্ষ্য। সমালোচক ফুকোর এই ভাবনা সম্পর্কে বলছেন:

> 'আধুনিক সমাজের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছেন প্রতাপের নব্য কৃৎকৌশলের বহুমুখী ও চাতুর্যপূর্ণ উপস্থিতি। এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জীবন-প্রক্রিয়ার উপর আধিপত্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত হয়।'°

ক্ষমতা দখলের কণ্ঠস্বর হিসেবে বাজতে থাকা প্রভুত্বকারী বাচন সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেবল তার স্বর বদল করে মাত্র---বদল হয় আগ্রাসনের কেতা, কিন্তু অবিকৃত থাকে দখলের নিহিত রাজনীতি। ক্ষমতা এবং আধিপত্যের রাজনীতি বিষয়ে এই কথাগুলো এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, কারণ উনিশ শতকের নগর কলকাতার বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেও এই আধিপত্যবাদের আগ্রাসী থাবার উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। মান্য তথা শিষ্ট বনাম অপরের দ্বন্দেও সেই আধিপত্য-আনুগত্যের জটিল অঙ্কই উত্তর সমাধানের খোঁজে দিশাহারা। উপনিবেশের প্রভুর রচিত মায়া-বিশ্বের শরিক হতে চেয়ে তথাকথিত ভদ্র-শ্রেণির মোহাবিষ্ট হওয়া এবং এতকালের চেনা পৃথিবীকে অচেনা করে দেওয়া, চেনা মানুষগুলোকে অপর করে দেওয়ার এই পর্বই জন্ম দিয়েছিল পারস্পরিক সংঘাতের। এই প্রান্তিকায়নের ফলে কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত জনতার কণ্ঠরোধের সার্বিক চেষ্টা হলেও তাকে সর্বার্থে প্রতিহত করা সম্ভব হয়নি। ফলে উনিশের কলকাতার বুকে ঘনিয়ে ওঠা মান্য বনাম অপরের যাবতীয় সংঘাত, যার মূলে আছে ক্ষমতার রাজনীতি, তাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে ক্ষমতার চরিত্র সম্পর্কে একটা সম্যুক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

উনিশের নগর কলকাতার বুকে যে মান্য বা শিষ্ট এবং অপরের বিভাজন, সেই বিভাজনে ইন্ধন দিয়েছিল সাময়িক নানাবিধ প্রসঙ্গ। আর সেসবকে কেন্দ্র করে দুপক্ষই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছিল আসরে। সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাতেও ধরা আছে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিবৃত্ত। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপরেখা সন্ধানই এই অধ্যায়ের লক্ষ্য। সমালোচক হার্দিকব্রত বিশ্বাস বলছেন:

'সহাবস্থান ও অবস্থানের গোলমাল আর ঠোকাঠুকি তো ছিলই। সমাজ ও জাতির গঠনকে কেন্দ্র করে যে একাধিক পক্ষের জন্ম এই সময়ে-সেইসব জীবনের স্থায়ী বা অস্থায়ী সাফল্য নির্ভর করেছে অনেকটাই তাঁরা কীভাবে একে অপরের ছবি এঁকেছেন নকশায়, নভেলে, প্রহসনে, ছড়ায়, কাব্যে, ইস্তেহারে, প্রবন্ধে, সাময়িক পত্রপত্রিকায়, খবরের কাগজে ইত্যাদি নবলব্ধ মাধ্যমে।'8

সেখানে সন্ধান করলেই অপরকে কী চোখে দেখেছে শিষ্টবর্গ এবং তার বিপরীতে শিষ্টকে কী চোখে দেখেছে অপর---তা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এই দেখার সূত্র ধরেই উঠে আসতে থাকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা প্রসঙ্গ। কখনো উঠে আসে সেকাল তোলপাড় করা অশ্লীলতা প্রসঙ্গ, কখনো উঠে আসে সাংস্কৃতিক দ্বন্দের নতুন নতুন সূত্র, নান্দনিকতা এবং নব্য নাগরিকতার প্রসঙ্গ, কখনো ধরা পড়ে সাহিত্যে ভাষা-কেন্দ্রিক রাজনীতি, সাময়িকতা এবং চিরন্তনত্বের দ্বন্দ্ব, রক্ষণশীলতা আর প্রগতিশীলতার নানা টানাপোড়েনের কথা। বিস্তারিত আলোচনায় এই দ্বান্দ্বিকতার রেখাচিত্র তুলে ধরা যাক।

প্রথম পরিচছেদ

দুই পৃথিবীর সংঘাতের রেখাচিত্র

প্রসঙ্গ অশ্লীলতা

বাঙালির সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক রুচি বদলের তথাকথিত মহৎ উদ্দেশ্যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য প্রভুশক্তির নানাবিধ হস্তক্ষেপ শুরু হয়। ধর্মপ্রচারই হোক বা শিক্ষাবিস্তার, উভয় ক্ষেত্রেই তারা শুচিতা, রক্ষণশীলতা, নীতিমূলকতার জয়গান করতে থাকে এবং একই সঙ্গে আমাদের দেশজ সাহিত্যসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। এর পিছনে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। বিশেষত অত্যন্ত গোঁড়া Evangelist সম্প্রদায়ের যেসব ইংরেজ এদেশে উপস্থিত ছিল তারা দেশীয় আমোদ-প্রমোদের সমস্ত উপকরণকেই সন্দেহ করত অশ্লীল বলে। জেমস মিলের (১৭৭৩-১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ) 'দি হিন্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া'র (১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ) মূল প্রতিপাদ্যই ছিল এদেশের অধিবাসীদের জীবন-চর্যার সঙ্গে জড়িত যাবতীয় বিষয়ের ক্রটির সন্ধান আর ছিদ্রাম্বেশ। মিলের বক্তব্য চমৎকার উপস্থাপন করেছেন সমালোচক শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর রচনায় :

'জগতের 'অমার্জিত ও অজ্ঞ' মানুষদের মধ্যে হিন্দুরাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট : তাদের নীতির বালাই নেই, স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়, তারা ঠকবাজ, জন্মবিশ্বাসঘাতক। সমগ্র হিন্দুসাহিত্যে সৃষ্টি ও বিশ্ব সম্পর্কে এমন কোনো চিন্তা বা কল্পনার নিদর্শন নেই যাতে মনীযা বা সৌন্দর্যের ন্যূনতম পরিচয় আছে; আছে কেবল 'বিশৃঙ্খলা, অস্থিরচিত্ততা, কামোচ্ছ্বাস, দ্বন্দ্ব, দৈবীলক্ষণ, প্রকাণ্ডকায় দৈত্য দেবতা, হিংস্রতা এবং বিকৃতি।'

অর্থাৎ তারা সভ্যতার একেবারে তলদেশে এক আদিম স্তরে আটকে আছে। তাদের আচার-আচরণ, শিল্প-স্থাপত্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডই আদিমতার দোষ-গন্ধবহ, সুতরাং অশ্লীল ও অমার্জিত। তাই তৎকালীন লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা ও উপধারা হয়ে উঠেছিল তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। বাংলার দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতির অপরায়নে অনেকখানি ইন্ধন যোগান দিয়েছিল শ্লীলতা ও অশ্লীলতা কেন্দ্রিক সমকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক।

সাহিত্যের জগতে শ্লীলতা-অশ্লীলতার বিচার আবহমানকাল ধরে চলে আসছে এবং অশ্লীলতা যে কাব্য বা সাহিত্যের শোভা বৃদ্ধি করে না, এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। কিন্তু উনিশ শতকের কলকাতায় 'অশ্লীলতা'র যে সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছিল তা

ছিল সম্পূর্ণভাবে আধিপত্য-কামী শাসকের অঙ্গুলিহেলনে তার একনিষ্ঠ ভক্তবৃন্দ কর্তৃক নির্ধারিত একটি ধারণা, যা আমদানি করা হয়েছিল পাশ্চাত্য থেকে। এর মূল লক্ষ্য ছিল শরীর। শরীর-কেন্দ্রিক যা কিছু সবই অঙ্গ্লীলতায় পর্যবসিত হয়েছিল। এর আগে রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গারমূলক প্রেম-পদাবলির পাঠে, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল এর বিদ্যাসুন্দর অংশে, নায়ক-নায়িকার দেহ এবং দেহ-কেন্দ্রিক প্রেম-বর্ণনায় বা রতিক্রিয়ার বর্ণনায় কেউ অপ্রস্তুত বা লজ্জিত হত না, বরং আসরে বসে সরাসরি তার রসগ্রহণ করত সকলে। আদিরসের চর্চা নিন্দনীয় ছিল না। দীর্ঘকাল আদিরস সাহিত্যে সগৌরবে তার যাত্রা অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গেনিবেশিক আমলে তাতে জারি হল নানা নিষেধ। তবে উপনিবেশের প্রাথমিক পর্বেও এই নিয়ে তেমন ছুৎমার্গ ছিল না। সেকালে বাঙালি পাঠক আদিরসাত্মক গ্রন্থ সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তখনও জনপ্রিয়তায় ভারতচন্দ্রের (১৭১০-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ) বিভিন্ন রচনার জুড়ি মেলা ভার ছিল। বিশেষত 'বিদ্যাসুন্দর'-এর চাহিদা ছিল দেখার মত। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে সমাচার দর্পণ এ প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে:

'সংপ্রতি এই কলিকাতা মহানগরে বিদ্যাসুন্দর ও রতিমঞ্জরী ও রসমঞ্জরী প্রভৃতি আদিরস ঘটিত যে যে গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে তাহা বাবুদিগের নিকটে আগতমাত্রে সমাদর পুরঃসর মূল্যপ্রদানপূর্বক গ্রহণ করিয়া দিবারাত্রি আমোদে আমোদিত হইয়া থাকেন…।'

উনিশের শুরুতে এই আদিরসাত্মক বইয়ের বিপুল চাহিদা প্রসঙ্গে গবেষক স্বপন বসু জানাচ্ছেন:

'উনিশ শতকের প্রথমদিকে আদিরসাত্মক বই-এর এত চাহিদা দেখা দিল কেন? উনিশ শতকে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাতে এদেশে একদল মানুষের হাতে এসেছিল অপর্যাপ্ত অর্থ। শিক্ষাদীক্ষা এবং সংস্কৃতিহীন এইসব মানুষেরা মনে করতেন ভোগেই বুঝি জীবনের সার্থকতা। আর জীবন তো ছোটো-বড়ো ক্ষণস্থায়ী, কাজেই যা করে পারো, সুখের পাত্র পূর্ণ করে নাও; এই ছিল তাঁদের মনোভাব। একদিকে নবাবি আমলের সুখস্মৃতি, অন্যদিকে এদেশবাসী ইংরেজদের উচ্চুঙ্খল জীবনযাত্রা চোখের সামনে দেখে তাঁরাও ওই পথ অনুসরণে প্রবৃত্ত হলেন।'

বাবুদের রঙিন জীবনে নেশা ঘনিয়ে তুলতে আদিরসাত্মক রচনাতে বাজার ছেয়ে যেতে লাগল। শুধু ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' নয়, তার অক্ষম অনুকরণে রচিত দেহে- মনে রোমাঞ্চ জাগানো বইতে ভরে গেল বাজার। গবেষক বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ) বলছেন :

'বটতলার সাহিত্যিকদের যেন গুরু হয়ে উঠলেন ভারতচন্দ্র এবং প্রেরণার অফুরন্ত নির্বার হল 'বিদ্যাসুন্দর' ও 'রসমঞ্জরী'। কলকাতার সূতানুটির কবি কালীপ্রসাদের 'চন্দ্রকান্ত' কাব্য এবং 'কামিনীকুমার', 'রহস্যবিলাস', 'সুকুমারবিলাস', 'জীবন্যামিনী', 'মধুমালতী', 'সতীত্ব-সুধাসিক্ব', 'প্রেমোপদেশ নাটক', 'স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ', 'কমলদন্তা-হরণ', 'প্রেমোল্লাস', 'রসিকতরঙ্গিণী' প্রভৃতি বটতলার সাহিত্য মূলত বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরীর ধারা বহন করে চলল।'

উনিশ শতকের প্রথমদিকে নব্য-শিক্ষিতের রুচিও খুব একটা মার্জিত হয়ে উঠতে পারেনি। এসব বইয়ের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ তারাও অনেকক্ষেত্রেই এডাতে পারত না। ভদ্রলোকেরাও কখনো প্রকাশ্যে, কখনো গোপনে এসব বইয়ের স্বাদ নিত। আর যেসব নব্যযুবকের কাছে বাংলা ছিল ছোটলোকের ভাষা, অশিক্ষিতের ভাষা, তারাও অনেক সময় এসব বই পড়ে রস উপভোগ করত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর' লেখায় তার নিদর্শন আছে। উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী বাবু ফালতু ছাই ভস্ম বাংলা বইয়ের ওপর অতি বিরক্ত, যাকে বলে হাড়ে চটা। বাংলা বই পড়ায় তীব্র অনীহা। কিন্তু স্ত্রীর একান্ত অনুরোধে একখানি বাংলা বই পড়তে রাজি হলে স্ত্রী একটি 'অপকৃষ্ট অশ্লীল এবং দুর্নীতিপূর্ণ অথচ সরস বই' স্বামীকে পড়তে দেন। পড়ার পর স্বামী-দেবতার প্রতিক্রিয়া এরকম : 'বেড়ে। বাংলায় যে এমন বই হয়, তা আমি জানিতাম না।' সমকালের এই চাহিদার দৃষ্টান্ত সাহিত্যের পাতা থেকেই খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন উনিশ শতকের প্রথম দিকে রচিত 'দূতীবিলাস' (১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ) এর সাক্ষ্য দেবে। এর গ্রন্থ-সূচনা অংশে রচয়িতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করেছেন প্রসিদ্ধ ধনী নিমাইচরণ মল্লিকের সপ্তম পুত্র স্বরূপচন্দ্রের অনুরোধে তিনি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। স্বরূপচন্দ্রের আক্ষেপ ছিল:

> 'মুদ্রা করে বহু গ্রন্থ প্রকাশ হইল। কিন্তু আদিরস কাব্য দেখিতে না পাই। যে দেখি ভারতকৃত নব্য কিছু নাই।।'^{১০}

সুতরাং তিনি ভবানীচরণকে 'আদেশ দিলেন গ্রন্থ করিতে রচনা'। এখানেও বারংবার নায়ক-নায়িকার 'কামসাগর মন্থন' এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে তৎকালের রুচিতে আদিরসের চর্চা নিন্দার বিষয় ছিল না। আসলে সেকালে আট থেকে আশি সকলেই আদিরসের ভক্ত ছিলেন। আর যে অশ্লীলতা নিয়ে আগামী তোলপাড়, তা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি বিষয়। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন :

> 'সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না।…তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল'^{১১} ইত্যাদি।

এমনকি তখন সংবাদ ও সাময়িকপত্রেও অশ্লীলতার চর্চা হত নিয়মিতভাবে। শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ) লিখেছেন :

'...'রসরাজ', 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রভৃতি অশ্লীলভাষী কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলেও 'প্রভাকর' ও 'ভাস্করের' ন্যায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না।'^{১২}

কিন্তু সময় যত এগোতে লাগল, ততই পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা কিছু ধারণা ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মগজে এঁটে বসতে শুরু করল। তার ফলে বঙ্গ-জীবনের এতকালের প্রচলিত শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিচার করা হতে থাকল পাশ্চাত্য প্রভুর অঙ্গুলিনির্দেশে নির্মিত মানদণ্ডে। এই অশ্লীলতার হিড়িকে এতকালের প্রচলিত সমস্ত কিছুতে যৌনাত্মক অনুষঙ্গ খুঁজে বার করার রোগ নব্য শিক্ষিত বাঙালি সমাজকে পেয়ে বসছিল। এর ফলেই এতকালের প্রচলিত যাবতীয় জনপ্রিয় সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক ধারাগুলির ওপর নেমে এল খাঁড়ার ঘা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই বিতর্ক প্রবল আকার ধারণ করল। সাহিত্য যে কেবল ব্যক্তিগত বা কেবল সমাজগত রুচির মাপকাঠিতে বিচার্য নয়, এমনটা ভাবার মত মতি শুচিবায়ুগ্রস্তদের ছিল না। বরং ভিক্টোরীয় যুগের নৈতিক শুচিতার পুচ্ছ ধরে ইংরেজ-ঘনিষ্ঠ বাঙালি অশ্লীলতার এক নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিল।

পাশ্চাত্যে ভিক্টোরীয় নৈতিকতা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে Thomas Bowdler (১৭৫৪-১৮২৫ খ্রিস্টাব্দ) উইলিয়ম শেক্সপিয়র-এর (১৫৬৪-১৬১৬ খ্রিস্টাব্দ) কালজয়ী নাটককে অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তার শ্লীল সংস্করণ প্রস্তুত করতে শুরু করেন। কেবল যেগুলি অশ্লীল বা অবাঞ্ছিত মনে হয়েছিল সেই কথাগুলি বাদ দিয়ে দেওয়াই নয়, জোর করে নীতিশিক্ষাও চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এ সময়ে রচনার মধ্যে। যেমন 'Cymbeline' নাটকে একটি গানে ছিল 'With everything that pretty is/ My lady sweet arise', কিন্তু এতে নীতিবোধ জাগবে না, সুতরাং শেষ পংক্তিটি করা হল 'For shame, thou sluggard arise.' ঠিক একই ভাবে

প্রভুর অনুগত ভৃত্যের মত এদেশেও কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারতের শ্লীল সংস্করণের কাজ শুরু করেন অধ্যাপক পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (১৭৭৫-১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দ)। এদেশের সর্বজন-মান্য সাহিত্যিক নিদর্শনগুলিই যখন অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তখন লোকজ পরম্পরার সাহিত্য-সংস্কৃতি যে তা থেকে নিস্তার পাবে না, সেকথা বলাই বাহুল্য। ফলে অশ্লীলতা বিরোধী অভিযানে এককথায় খারিজ হয়ে যেতে লাগল এতকালের প্রচলিত পৌরাণিক নানা কাহিনি, আদিরসাত্মক নানা আখ্যান। কবিগান, যাত্রা, পাঁচালি, খেমটা, আখড়াই, হাফ-আখড়াই, সং এই সবই কুরুচিপূর্ণ বলে গণ্য হল। বটতলাও রেহাই পেল না। মূলধারার ক্ষেত্রে এদের অস্বীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হল।

অশ্লীলতার বিতর্কে বটতলার দুর্দশা কিছু কম হয়নি। উনিশ শতকের নব্য-শিক্ষিত বাঙালির আলোকিত মানসলোকে বটতলার কোনো স্থান ছিল না। তাদের ধারণায় বটতলা মানেই যাবতীয় অশ্লীলতার আখড়া। সেখানে মেলে কেবল ইতর ছ্যাবলামি এবং অশ্লীল আদিরসাত্মক কুৎসিত চটি পুস্তক। ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইতিহাসের অধ্যাপিকা অনিন্দিতা ঘোষ জানাচ্ছেন:

'ঊনবিংশ শতান্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বটতলা' একটি অস্বস্তিজনক অধ্যায়। সস্তা কাগজে ছাপা, হালকা মেজাজের, কথ্যভাষায় রচিত, ও মেঠো আদিরসাত্মক রসিকতায় অলংকৃত অজস্র পুন্তিকার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বাংলা বইয়ের এই বাজারটি সমকালীন ভদ্রসমাজ বিশেষ সুনজরে দেখেনি। প্রকৃতপক্ষে, পাশ্চাত্য সভ্যতার ছায়ায় পালিত উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি তার দেশজ ঐতিহ্যের জনপ্রিয় ও জীবন্ত ধারাটিকে 'ইতর' ও 'অশ্লীল' সাব্যস্ত করে তার সার্বিক সংস্কারে উদ্যোগী হয়। উচ্চশিক্ষিত বিদ্বজ্জনের সংশোধনকারী অভিধানে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত বটতলা তাই হাজির হয় সভ্যতার কাঠগড়ায়, এবং সময়ে অপবাদটি প্রবর্তিত হয় পরবর্তী প্রজন্মের হাতে।'^{১8}

আসলে বটতলাকে কোণঠাসা করার পিছনে অন্য একটা কারণও ছিল। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই স্কুল বুক সোসাইটির সাহায্যে নীতিমূলক পুস্তিকা প্রচার শুরু হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন সেখান থেকে ছেপে বেরোনো নীতিমূলক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থগুলি জনমনে সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। সেই উপদেশে সমৃদ্ধ গ্রন্থগুলিকে বটতলার বাজারচলতি বইয়ের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় পড়তে হচ্ছিল। কিছুতেই সংস্কারকের উপদেশাবলি বটতলা সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাবের জন্ম দিতে পারছিল না। তাই

বাধ্য হয়েই আইন এবং প্রশাসনের সাহায্য নিতে হয়েছিল। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রেভারেন্ড জেমস লঙ (১৮১৪-১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ) কলকাতার নানা ছাপাখানা থেকে মুদ্রিত প্রায় ১৪০০ বইয়ের একটি তালিকা তৈরি করে প্রকাশ করেন। সেই তালিকায় কবিগান, পাঁচালি ইত্যাদির যে সংকলনগুলি ছিল সেগুলি তাঁর ভাষায় ছিল filthy and polluting, আর কামশাস্ত্রমূলক, আদি বা শৃঙ্গার-রসাত্মক বইগুলি (যেমন কামশাস্ত্র, রসতরঙ্গিণী, প্রেমতরঙ্গ, রতিবিলাস, সম্ভোগ রত্নাকর ইত্যাদি) তাঁর মতে 'বিস্টলি, ইকুয়াল টু দ্য ওয়ার্স্ট অফ দ্য ফ্রেঞ্চ স্কুল।'^{১৫} কিন্তু লঙ যেসব বইকে পাশব প্রকৃতির, নিকৃষ্টতম বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল কামশাস্ত্রের নানাবিধ রকমফের। ভারতীয় সংস্কৃতিতে কাম-চর্চা নিন্দার বিষয়ও ছিল না। কিন্তু তাঁর এই তালিকা প্রকাশের পরের বছরই ভারতীয় আইনসভায় অশ্লীলতা বিষয়ে আইন পাস হয়। আর তা গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন লাভ করে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে। আইন অনুসারে কুৎসিত ছবি এবং শৃঙ্গাররসঘটিত পুস্তক প্রকাশ আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। আইন অমান্য করলে শাস্তিস্বরূপ কারাদণ্ড এবং জরিমানার কথা উল্লিখিত হয়। সম্রম কারাদণ্ডের মেয়াদ তিনমাস এবং জরিমানার পরিমাণ ১০০ টাকা। এই আইন শুধু কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রযুক্তও হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের বিচারে চার আনা দামের তিনটি অশ্লীল বই বিক্রির অপরাধে তিনজন শাস্তি পেয়েছিল। তাদের ১০০ টাকা করে জরিমানা হয়েছিল। সরকার বাহাদুরের কাছে লঙ আবেদন জানিয়েছিলেন অনেক আগে থেকেই। বারংবার তাগাদাও দিচ্ছিলেন যাতে আইন করে এসব বই বিক্রি দমন করা যায়। শ্রীপান্তের (১৯৩২-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ) 'বটতলা' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে। তিনি দেখিয়েছেন কেমনভাবে অশ্লীলতা বিরোধী আইনের আগে পরে বটতলার প্রকাশকদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছিল। বিশ্বস্তর এবং মহেশ নামক দুই ব্যক্তির ৫০ টাকা করে জরিমানা হয়েছিল, এছাড়া অশ্লীল বই বিক্রির অপরাধে মধুসূদন শীল নামে এক ব্যক্তির ১০০ টাকা জরিমানা হয়েছিল। বিদ্যাসুন্দর বিক্রির অপরাধে পুলিশ বটতলার বেশ কয়েকজন বই বিক্রেতাকে গ্রেপ্তারও করেছিল। এই আইনের পক্ষপাতীরা দাবি করেছেন আইন পাস হবার পর রাতারাতি প্রকাশকেরা বহু অঞ্লীল পুস্তক পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। ইতর রুচির অপসারণে এসব পদক্ষেপ একেবারে অগ্রাহ্য করার মত ছিল না। সমাজে এই নিয়ে বেশ বড় রকমের আলোড়ন উঠেছিল।

দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতির দ্বারা সমাজে দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে দাবি করে তা রোধের জন্য এই অভিযান চরম আকার ধারণ করেছিল শাসকঘনিষ্ঠ ইংরেজ পাদ্রি, দেশনায়ক, শিক্ষাবিদ ও বাঙালি ভদ্র-শ্রেণির আনুকূল্যে। নব্য-শিক্ষিতের হাতে জ্ঞানচর্চার নতুন ক্ষমতা-বৃত্ত নির্মিত হলে সেখানে প্রস্তুত হয়েছিল শোভনতার নতুন রীতি, শ্লীলতার নতুন পাঠ। শ্রীপাস্থ বিবরণ দিয়েছেন :

'ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে...কলকাতায় বইতে শুরু করেছে ভিক্টোরিয় ইংল্যান্ডের নৈতিকতার পরিশোধিত সুপবন।...একদিকে পাদ্রি এবং রাজপুরুষ আর তাঁদের সহযোগী হিসাবে ইংরেজি শিক্ষিত নব্যনীতিবাগীশ লেখক, বুদ্ধিজীবী সুরুচি ও সভ্য আচারের পতাকাবাহীর দল...রাজানুগ্রহ লোভী বশংবদ কিছু সমাজপতি সেদিন স্বদেশী শিল্প সাহিত্য এবং সাধারণের আমোদ-প্রমোদ ও জীবনরীতির বিরুদ্ধে এক ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ। কেননা, যা বিদেশী যাজক, বিদেশী শাসক এবং সুসংস্কৃত ইংরেজ সমাজ অনুমোদিত নয়, তা-ই অসভ্যতা।'

এসবের ফলস্বরূপ ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউন হলে একটি সমাবেশ হয়েছিল বিশিষ্ট নব্য শিক্ষিত সমাজপতিদের নিয়ে। তাঁরা সাধারণ জনগণের মধ্যে অশ্লীলতার বিষ ছড়িয়ে পড়ছে এই আতক্ষে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। সেখানেই সংগঠিত হয়েছিল 'দি সোসাইটি ফর দি সাপ্রেশন অব অবসিনিটি ইন ইন্ডিয়া'। জনগণের চিত্ত-শোধনের সে এক মরণপণ প্রয়াস। রথী মহারথীদের মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, ব্রাক্ষ সকলেই ছিলেন। কেশবচন্দ্র সেন, বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবগোপাল মিত্র, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের পাশাপাশি সৈয়দ আমির আলি, মৌলবি আবদুল লতিফ খান বাহাদুর প্রমুখের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের ইস্তাহারে বলা হয়েছিল:

'...So many hundred native gentlemen should have gathered today in the Town Hall of Calcutta for such a purpose as the promotion of pure, and the suppression of undoubtedly victious literature. This meeting is an unmistakable proof of the existence of a sound native opinion on the subject, of a growing moral sense in the community.'⁵⁹

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করেছিলেন :

'যেখানে দাশুরায়ের পাঁচালী গমন করিবে, যেখানে বিদ্যাসুন্দর গমন করিবে, তার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোর পাপ গমন করিবে। আমরা বলিতেছি না যে বিদ্যাসুন্দরের সমুদয় ভাবই অপবিত্র,

আধিপত্যের উনিশ শতকীয় রাজনৈতিক সংঘাত : মান্য বনাম অপর

আমরা বলিতেছি না যে দাশু রায় পাপপূর্ণ শব্দ ভিন্ন আর কোনও ভাষাতেই আপন বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন নাই। কিন্তু এই দুই পুস্তকেরই সংশোধন আবশ্যক। '১৮

এমনকি তিনি বিভিন্ন প্রকাশকের কাছে অতর্কিতে হানা দিয়ে অঞ্লীল বই খুঁজে তা ধ্বংস করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন:

'যাঁহারা 'কি মজার শনিবার' ইত্যাদি কতকগুলি বাজে পুস্তক লিখিয়া বাহাদুরী প্রকাশ করিতে চাহেন, বটতলা যাঁহাদের বিদ্যাপ্রচারের স্থান, স্কুলের বালকদের সর্বনাশ করা যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য, এবং আপনাদের মনের দুর্গন্ধ পদ্ধ যাঁহারা ঘরে বাইরে ছড়াইতে ভালবাসেন, সেই অসাধারণ 'ভদ্রলোকদিগের' চরিত্র আর আমরা লুকাইয়া রাখিতে পারি না।'^{১৯}

বিষ্ণমচন্দ্রও অশ্লীলতা নিবারণের জন্য আইনের পক্ষেই মত দিয়েছিলেন। তাঁর মতে আইন না হলে নিম্ন-রুচির স্থূল অমার্জিত বটতলার সাহিত্য জন-চিত্ত দৃষিত করে ফেলার কাজে সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করে ফেলবে। এই শ্রেণির পাঠক এবং লেখক উভয়ের প্রতিই বিষ্ণমের মনোভাব স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। বিষ্ণমচন্দ্র জানাচ্ছেন:

'সামান্য শিক্ষার বৃদ্ধি হওয়ায়, অল্পশিক্ষিত পাঠকের শ্রেণী বাড়িয়াছে। তাহারা কি পড়িবে?…তাহাদের মনোরঞ্জনার্থ এক শ্রেণীর লেখক উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারাও সেই অল্পশিক্ষিত শ্রেণীর লোক-তাহাদের রুচি মার্জিত ও পরিশুদ্ধিত হয় নাই-সুতরাং অল্পীলতা ও কদর্যতাপ্রিয়। লেখক-পাঠক উভয়ই এক শ্রেণীর লোক।'^{২০}

সে সময় শিক্ষিত বাঙালির চোখে আদর্শ পুরুষ ছিল ইংরেজ। আর তার মধ্যে অন্যতম প্রধান মেকলে সাহেব (১৮০০-১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ) যখন ঘোষণা করেন যে সংস্কৃত সাহিত্য অতি অসার, যখন বলেন :

'A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia,.'\2

তখন নব্য শিক্ষিত সে কথার ফাঁদেই আটকে পড়েছিল। মেকলে আরও বলেছিলেন যে:

'I doubt whether the Sanskrit literature be as valuable as that of our Saxon and Norman progenitors.' ??

আলেকজান্ডার ডফ (১৮০৫-১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) বলেছিলেন :

'প্রাচ্য ভাষাসমূহ সমুদ্রের ন্যায় মহান, অতল এবং অকূল; কিন্তু বহুদিন অম্বেষণ করিয়াও আমি কখন ইহাতে মুক্তা দেখিতে পাইলাম না।'^{২৩}

এসব কথা শুনে নবীন ইংরেজি শিক্ষিতেরা 'সত্য সত্যি মনে করিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে শিক্ষণীয় কিছুই নাই; ইহা কেবলই কুশ-তৃণের গুণাগুণে এবং ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি সমুদ্রের বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ।'^{২৪} তাতে জ্ঞাতব্য কিছু থাকতে পারে একথা চিন্তা করার প্রবৃত্তিও নব্য-শিক্ষিতের থাকেনি। তাঁরা 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ছেড়ে 'ইলিয়াড', 'ওডিসি'তে মগ্ন হয়েছেন। মধুসূদনের জীবনচরিত রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন:

'স্বদেশীয় কাব্য পুরাণাদিতে অভিজ্ঞতা লাভের চেষ্টা দূরে থাকুক, সে সম্বন্ধে কোনোরূপ জ্ঞান না থাকাই যেন তাঁহাদিগের পক্ষে গৌরবকর হল। তাঁহারা আকিলিসের অথবা আগামেমননের উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষের নাম বলিতে পারিতেন, কিন্তু মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য কি প্রপৌত্র জিজ্ঞাসা করিলে নির্বাক হইয়া থাকিতেন।'^{২৫}

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন :

'বেদব্যাসের ও বাল্মীকির ভাষারই যখন এই দুর্দশা ঘটিল, তখন দুঃখিনী বাঙ্গালা ভাষার অবস্থা আর কি লিখিব? হিন্দু কলেজের অনেক খ্যাতনামা ছাত্র বাঙ্গালায় বিশুদ্ধরূপে আপন আপন নামও লিখিতে পারিতেন না। বাঙ্গালা ভাষা বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব আছে, বা থাকিতে পারে, তাহা তাঁহাদিগের মনে উদিত হইত না। দোকানদারদিগের ও অশিক্ষিত বৃদ্ধদিগের পাঠের জন্য 'রামায়ণ', 'মহাভারত' নামে দুইখানি পদ্যগ্রন্থ আছে, এই মাত্র তাঁহারা জানিতেন।' ইড

বাংলা পাঠে তাঁদের রুচি ছিল না। ইংরেজির প্রতি অনুরাগ প্রকাশের বাসনায় বাংলার প্রতি অবহেলা চরমে উঠেছিল। মাতৃভাষা-চর্চায় বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। উনিশ শতকের নব্য শিক্ষার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজে বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল নামমাত্র। সেখানকার বাংলা শিক্ষার অব্যবস্থা সম্পর্কে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' লিখেছিল:

'তথায় পাঠের শৃঙ্খলা নাই, উপযুক্ত শিক্ষক নাই, পাঠ্য গ্রন্থও নাই, এবং কেহ তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধারণও করে না। বাংলা শিক্ষা করা আর না করা একপ্রকার ছাত্রদিগেরই স্বেচ্ছাধীন।'^{২৭}

দেশজ সংস্কৃতির প্রতিও তাঁদের মনোভাব ছিল একইরকম। সমালোচক ভূদেব চৌধুরী (১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ) জানিয়েছেন :

'শহুরে মধ্যবিত্তরা জীবন্যাত্রার জন্য ভূমিজ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল হয়েও গ্রামীণ জীবন ও সমাজ থেকে প্রথমাবধি নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেছেন প্রধানত নিজেদের শিক্ষাগত আভিজাত্যবোধের উন্নাসিকতায়। শহুরে বাবুদের প্রধান গর্ব ছিল তাঁদের বিদ্যা ও বৃদ্ধির উৎকর্ষে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা এই বিচ্ছেদের সঙ্গে গৌরব বোধের যোজনা করেছিল।...তাছাড়া, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ক্রমিক প্রখরতা সামাজিক অনুভবকে দানা বাঁধতে দেয় নি কখনো। ফলে শহরে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা প্রথমাবধি ছিলেন নিঃসমাজ। অথচ সাহিত্যের যা-কিছু মূল্য তো সামাজিক মানুষের আন্তরিক আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবেই। সমাজ নেই, সাহিত্য আছে---এরকম উদ্ভট অবস্থার অল্পবিস্তর মুখোমুখি হতে হয়েছে বাংলা সাহিত্যকে উনিশ শতক থেকেই। বিকল্প হয়ে দেখা দিল এক নতুন ব্যবস্থা-অভিজ্ঞতা-অনুভবের শৃন্যতা পূরণ করতে এল বিদ্যা ও বুদ্ধির আভিজাত্যাভিমানী নৃতন কসরৎ। এই প্রবণতার ফলেই সমাজে এবং জীবনে অমূল বুদ্ধিজীবিতার ক্রমিক উদ্ভব।'^{২৮}

এ প্রসঙ্গে William Baret এর সেই কথাটি উল্লেখ করা যেতে পারে :

'Intellectuals as a class suffer from the degree that they are cut off from the rest of mankind.' the control of the control o

সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব

হুতোম (১৮৪০-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর বিখ্যাত নকশায় বলেছিলেন :

'যে দেশের লোকের যে কালে যে প্রকার হেম্মত থাকে, সে দেশে সে সময় সেই প্রকার কর্মকাণ্ড, আমোদ প্রমোদ ও কাজ কারবার প্রচলিত হয়। দেশের লোকের মনই সমাজের লোকোমোটিবের মত, ব্যবহার কেবল ওয়েদরককের কাজ্ করে।...আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা রঙ্গভূমি প্রস্তুত করে মল্লযুদ্ধে আমোদ প্রকাশ কত্তেন, নাটক ত্রোটকের অভিনয় দেখ্তেন,

পরিশুদ্ধ সঙ্গীত ও সাহিত্যের উৎসাহ দিতেন; কিন্তু আজ্কাল আমরা বারোইয়ারিতলায়, নয় বাড়ীতে বেদেনীর নাচ ও "মদন আগুণের" তানে পরিতুষ্ট হচ্চি, ছোট ছোট ছোলে ও মেয়েদের অনুরোধ উপলক্ষ করে, পুতুল নাচ, পাঁচালী ও পচা খেঁউড়ে আনন্দ প্রকাশ কচ্চি, যাত্রাওয়ালাদের "ছকুবাবু" ও "সুন্দরের" সং নাবাতে হুকুম দিচিচ। মল্ল যুদ্ধের তামাসা দ্যাখা "বুল্বুল ফাইট" ও "ম্যাড়ার লড়ায়ে" পর্যবসিত হয়েছে।"

এই বিবরণ থেকেই সেকালের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সাংস্কৃতিক রুচির একটা পরিচয় মেলে। তারা এই জাতীয় আমোদের মধ্যেই মনের আরাম খুঁজে পেত। আর এই রসাম্বাদনের ক্ষেত্রে উচ্চ-নিম্নবর্গের তেমন ভেদাভেদ ছিল না। রাধামাধব কর (১৮৫৩- অজ্ঞাত) উল্লেখ করেছেন:

'তখন বাঙ্গালী ভদ্রসমাজ যাত্রাগানের, কবির লড়াইয়ের, তরজায় প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিত। শুধু যে বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরাই এ আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহা নহে। যে গৃহস্থের প্রাঙ্গণে যাত্রাগান, কবির লড়াই প্রভৃতি হইত, তাঁহার গৃহে সেদিন সকলের অবারিতদ্বার; দ্বারে টিকিট দেখাইতে না পারিলে এই সামাজিক আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, এমন কল্পনা তখন কাহারও মনে উদিত হয় নাই।'^{৩১}

সুশীল কুমার দে'র (১৮৯০-১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ) লেখাতে তিনি বলেছেন :

'The existence of Kabi-Songs may be traced to the beginning of the 18th century or even beyond it to the 17th, but the most flourishing period of the Kabiwalas was between 1760 and 1850.'[©]

যেমন কলকাতার মস্ত ধনী 'রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন। ইংলন্ডের কুইন এলিজাবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্ত্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রকম-রাম বসু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তিনিই কবি গাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দ্যাখাদেখি অনেক বড় মানুষ কবিতে মাত্লেন। তাঁই বড় মানুষেরা কবিগানের আয়োজন করতেন। আর নির্দিষ্ট দিনে জনস্রোত ভরিয়ে দিত কবিগানের আসর।

এই কবিগানের আসর আরও একটি রূপান্তরের মঞ্চে পরিণত হত। এখানে ঐতিহ্যবাহী পৌরাণিক দেবতাদের নগরায়ন সম্পন্ন হত যুগের দাবিতে। গবেষক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ) জানাচ্ছেন :

'নতুন ঔপনিবেশিক শহরের সামাজিক পরিমণ্ডলে…লোককাব্যের চরিত্ররা কবিগানে, সমসাময়িক নাগরিকদের বেশভূষাতে সজ্জিত ও আচার-আচরণের অনুকারী। সে সময়ের কবিগানে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমালাপ বা শিব-পার্বতীর সাংসারিক কোন্দল (যা যথাক্রমে অতীতের বৈষ্ণব গীতিকাব্য ও মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য ছিল) তদানীন্তন শহুরে কথাবার্তা ও চালচলনের আকারে পরিবেশিত হত।'⁰⁸

অনেকক্ষেত্রেই কৃষ্ণ চরিত্রে মিলত হঠাৎ-রাজাদের ছায়া, যারা নিজ বাসভূমি ছেড়ে নতুন নগরে এসে পরিবার পরিজনের কথা ভুলে অর্থে-বিত্তে আমোদে-প্রমোদে কালহরণ করতেন। এ যেন নতুন ধারার মাথুর। রাম বসুর গানে মথুরা প্রত্যাগত দূতী রাধার কাছে গিয়ে জানান:

'গিয়ে দেখলাম শ্যামের এখন সে ভাব নাই, রাইকে নাহি মনেতে। মথুরাজ্যেশ্বর বংশীধর হয়েছেন এখন। রাজছত্র শিরে তাঁর দরশন পাওয়া ভার, গোপিকায় নাহিক স্মরণ।'^{৩৫}

নতুন নগরে নতুন পদে অভিষিক্ত হয়ে এই কৃষ্ণ যে শুধু রাধাকে ভুলে গেছেন তা-ই নয়, তিনি এখন সম্পূর্ণরূপে কুব্জার দ্বারা বশীভূত। এই কুব্জা কোনো অংশে রাধার তুল্য নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কৃষ্ণকে অধিকার করেছে। রাধা আর কুব্জার তুলনা প্রসঙ্গে কবিগানে বলা হচ্ছে :

'শ্যাম রূপেরো বিচারো যদি মনে করো
মজেছ যাহার কারণে
ওহে লক্ষ কুব্জারো রূপেরো ভাণ্ডারো
শ্রীমতী রাধার চরণে।।'°৬

আসলে পুরাণমতে মথুরার পরিচারিকা কুব্জা ছিল বক্র-পৃষ্ঠ। কৃষ্ণের স্পর্শে তার এই বিঘ্ননাশ হয়েছিল। কিন্তু লোককবিরা তার সেই কুৎসিত মূর্তিকেই বেছে নিয়েছেন গান রচনার সময়। দাশু রায়ের (১৮০৬-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) গানে দূতীর বয়ানে উল্লেখ আছে :

'তুমি বাঁকা, কুবজা বাঁকা, দুই বাঁকাতে মিলেছে। তোমার যেমন বাঁকা আঁখি, কুবজী তেমনি কোটর চোখী খাঁদা নাকে ঝুমকো নোলক দুলিয়েছে।'^{৩৭}

এর পাশাপাশি রাধাও বিবর্তিত হয়েছিল লোক-কবিদের গানে। কখনো সে হয়ে উঠছিল প্রবঞ্চিতা কুলবধূর প্রতিনিধি, যার প্রিয়তম তাকে গুরুত্ব না দিয়ে রক্ষিতার সঙ্গে

আধিপত্যের উনিশ শতকীয় রাজনৈতিক সংঘাত : মান্য বনাম অপর

রাত্রিযাপন করে। হরু ঠাকুরের (১৭৩৮-১৮০৮ খ্রিস্টাব্দ) গানে তেমনই প্রাণঘাতী সংবাদ রাধার হৃদয় বিদীর্ণ করে দিয়েছে :

> 'আছে চন্দ্রাবলীর ঘরে দেখে এলেম তোমার শ্যাম চাঁদেরে।। শুয়ে কুসুম শয্যাপরে।'^{৩৮}

কুবজা বা চন্দ্রাবলী সেখানে এক হয়ে গেছে প্রিয়তমের কুহকিনী রক্ষিতাদের সঙ্গে। আর এই যন্ত্রণা ভুলতেই হয়তো রাধার মধ্যে ফুটে উঠতে থাকে জনপদ-বধূর লক্ষণ। রাম বসুর (১৭৮৭-১৮২৯ খ্রিস্টাব্দ) গানে রাধার বক্তব্যে এসে পড়েছে যৌবন বেচাকেনার বিষয় :

'আমার যৌবন কিনে লয়, প্রেমধন দেয়, এমন পাইনে রসিক ব্যাপারী।'^{৩৯}

এই বঞ্চিত অবহেলিত নারীরাই তো ক্রমে বারাঙ্গনায় পরিণত হত। কুলাঙ্গনার বারাঙ্গনা হয়ে ওঠার নানা কারণের মধ্যে অন্যতম ছিল প্রিয়তমের অবহেলা এবং ছলনা, তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন 'উনিশ শতকের 'বাবু কালচার-এ' রাধার 'অভিসারিকা' রূপ ক্রমশই তদানীন্তন বারবনিতা বা রক্ষিতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাচ্ছিল।'⁸⁰ তাই শুধু কুলবধূর আক্ষেপেই নয়, অনেকসময় বারনারীর বয়ানেও মিলত রাধার ছায়া। 'সধবার একাদশী' প্রহসনে বেশ্যা কাঞ্চনের গানে যে নারীর তাপিত অন্তরের কথা ব্যক্ত হয়েছে সে নারী তো রাধাই :

'চলো লো সজনি সবে সরোজ কাননে যাই সুশীতল সমীরণে জীবন জুড়াই; বিনে নটবর, জ্বলে কলেবর, তাপিত অন্তর পুড়ে হলো ছাই।'⁸⁵

সুতরাং জনমানসের অন্যতম প্রিয় এবং পরিচিত চরিত্র রাধা যুগ আর পরিস্থিতির চাপে এভাবেই নানা ছাঁচে পুনর্বিন্যস্ত হয়ে উঠছিল। এছাড়াও আরও নানা বিষয় কবিগানে ব্যক্ত হত। 'সমাচার দর্পণ'এর পৃষ্ঠা থেকে কলকাতায় 'কবিতা সঙ্গীত সংগ্রাম' এর এক চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। বাবু গুরুচরণ মল্লিকের দয়েহাটার বাড়িতে বাগবাজার আর জোড়াসাঁকোর দলে মস্ত কবিতাযুদ্ধ হয়েছিল। সেখানে :

'প্রথমতঃ ভবানীবিষয় পরে সখীসম্বাদ পরে খেঁউড় ইহাতে উভয় দলে কবিতা কৌশলে তান মান বাণস্বরূপ হইয়া ঘোরতর সমর হইয়াছিল সে রণে রসিক বিচক্ষণসমূহের মনোরঞ্জন হইয়াছিল...।'^{8২} শুধু তাই নয়, কবিয়ালকে শুধু আমন্ত্রণকারীর নয়, জনতার পছন্দমত গান গেয়ে তুষ্ট করতেও হত। এই কবিগানের একটা শুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল খেউড়। এর ভক্ত ছিলেন বহু মানুষ, বিশেষ করে শহরের নিম্নশ্রেণির মানুষেরা এতে খুবই আনন্দ অনুভব করতেন। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ঘটনার কথা বলেছেন যা থেকে এর সাক্ষ্য মেলে। ঘটনাটি এরকম:

'ঐ সময় বিখ্যাত কবিয়াল নিতাই বৈরাগী (১৭৫১-১৮১৮) কোনো এক কবিগানের অনুষ্ঠানে 'সখী-সংবাদ' গাইছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে নিম্নশ্রেণিভুক্ত যাঁরা ছিলেন-অর্থাৎ 'ছোটলোকেরা'-আসরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলেন--- "হ্যাদ্ দেখ লেতাই, ফ্যার ঝিদ কালকুকিলির গান ধিল্ল, তো, দো, দেলাম; খাড় গা।" নিতাই কবিয়াল, এই শুনে তৎক্ষণাৎ একটি "মোটা ভজনের খেউড়", অর্থাৎ ওঁদের ভাষাতে 'খাড়'-গেয়ে শ্রোতাদের সম্ভুষ্ট করলেন।'⁸⁰

এই খেউড় গানের ওপরই যে বেশিরভাগ সময়ে কবির লড়াইয়ের ফলাফল নির্ভর করত, তাও যথার্থ। হুতোম তাঁর নকশায় কবির লড়াই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন:

'বিরহের পর চাপা কাঁচা খেউড়; তাতেই হার জিতের বন্দোবস্ত, বিচার ও শেষ (মধুরেণ সমাপয়েৎ) মারামারীও বাকি থাক্বে না।'⁸⁸

তাছাড়া তখনকার কলকাতায় 'কাদা খেউড়' বলে আরেকটি হুল্লোড় হত। মনে করা হয় তার উৎপত্তিস্থল কৃষ্ণনগরের রাজসভা। সেখান থেকে এই আমোদ হাজির হয়েছিল শহর কলকাতায়। মহেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৬৯-১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ) কথা থেকে জানা যাচ্ছে:

'তখনকার দিনে নবমীতে পাঁঠা ও মোষ বলি করিয়া গায়ে রক্ত, কাদা মাখিয়া মোষের মুণ্ড মাথায় হইয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘোরা হইত। আর বৃদ্ধ পিতামহ তাহার সমবয়ক্ষি লোক, পুত্র, পৌত্র লইয়া হাতে খাতা লইয়া কাদামাটির গান করিত। সে সব অতি অশ্লীল ও অশ্রাব্য গান। বাড়ীর মেয়েদের সম্মুখেও সেই সব গাওয়া হইত এবং পাছে ভুল হয় এজন্য হাতে লেখা খাতা রেখে দিয়েছে, ইহাকে অপর কথায় খেউড় গান বলিত। তখনকার দিনে এ সবের প্রচলন ছিল এবং লোকে বিশেষ আপত্তি করিত না বরং আনন্দ অনুভব করিত। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা ও কেশব সেন মহাশয়ের অভ্যুদয় হইতে ধীরে ধীরে এসব উঠিয়া যায়।'^{8৫}

সব জায়গায় অনাবশ্যক অতিরিক্ত শুচিতা ও শ্লীলতার আড়ম্বর দেখে প্রবীণ নাট্যাচার্য রাধামাধব কর এই বিষয়ে উত্তরপুরুষের কাছে আক্ষেপ করেছেন যে :

'আজকাল দেখিতেছি, আপনারা-কায়মনোবাক্যে কিনা বলিতে পারি না-অন্ততঃ বাক্যে, অত্যন্ত puritan ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন; কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ সরমে সঙ্কোচে আপনাদের নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠে। যে সঙ্গীতের আসরে ভদ্রসমাজের পিতা-পুত্র একত্র বসিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না; পর্দ্দার আড়ালে মাতা স্ত্রী কন্যার অধিষ্ঠান কাহারও কিছুমাত্র উদ্বেগের কারণ হইত না; সে সঙ্গীত আপনারা বোধ হয় আজকাল আপনাদের মোটা purist মাপকাঠীতে পরিমাপ করিয়া প্যুরিটান দর্জির দোকান হইতে কাটিয়া ছাঁটিয়া ভদ্রসমাজের উপযোগী করিয়া বাহির না করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন না। '8৬

যাত্রাও ছিল জনসংস্কৃতির এক সমুজ্জ্বল অধ্যায়। দীর্ঘকাল সে জন-চিত্তে নিজ মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল, পরে অশ্লীলতাসহ নানা দোষে তারও দুর্দশা ঘটেছিল ভদ্রসমাজে। রাধামাধব কর স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন :

'তখন কলিকাতায় যাত্রাগানের খুব ধুম। সর্ব্বেই যাত্রার আদর ছিল। গোবিন্দ অধিকারীর দল, রাধাকৃষ্ণ বৈরাগীর দল, বদন অধিকারীর দল, মহেশ চক্রবর্ত্তীর দল, বৌ মাষ্টারের দল, ঝোড়োর দল, বজ অধিকারীর দল, উমেশ মিত্রের দল (গোপাল উড়ের দল নামে প্রসিদ্ধা), মদন মাষ্টারের দল, লোকা ধোপার দল প্রভৃতি যাত্রার দল তখন বাঙ্গালী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। গোবিন্দ অধিকারী রাত্রিশেষে আসরে নামিতেন; তখন যাত্রা শুনিবার জন্য কর্ত্তারা আসিয়া বসিতেন। তৎপূর্বের্ব রাত্রি নয়টা হইতে তিনটা পর্যন্ত ছেলে ভুলাইবার জন্য অনেক রকম সঙ্বের ব্যবস্থা ছিল।'⁸⁹

রাধামাধব কর আরও জানাচ্ছেন 'গোবিন্দ অধিকারী বৃদ্ধ বয়সেও স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া বিন্দে দুতী সাজিয়া আসরে নামিতেন, অথচ কিছুমাত্র বেমানান বলিয়া মনে হইত না।'^{৪৮} মহেন্দ্রনাথ দত্ত ছোটবেলায় গোবিন্দ অধিকারীর (১৭৯৮-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) যাত্রা দেখেছিলেন। তখন গোবিন্দ অধিকারী রীতিমত বয়স্ক। কিন্তু তাঁর এমন জনপ্রিয়তা ছিল যে 'গোবিন্দ অধিকারী আসরে এসেছে এই তো একটা হৈ-চৈ

আধিপত্যের উনিশ শতকীয় রাজনৈতিক সংঘাত : মান্য বনাম অপর

পড়িল। ¹⁸⁸ এই বিষয়ে হুতোমের নকশাতেও উল্লেখ আছে যে রীতিমত বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিক নৈপুণ্যে নৃত্যগীত সহ নারীভূমিকায় অভিনয় করতেন অনেকেই। হুতোমের বিবরণ কিছুটা তুলে দেওয়া হল যেখানে তিনি বলছেন, বৃদ্ধ অধিকারী :

'দূতী সেজে গুটি বারো বুড়ো বুড়ো ছেলে সখী সাজিয়ে আসোরে নাবলেন। প্রথমে কৃষ্ণ খোলের সঙ্গে নাচ্লেন, তারপর বাসদেব ও মণি গোঁসাই গান করে গ্যালেন। সকেষ্ট সখী ও দূতী প্রাণপণে ভোর পর্যন্ত "কাল জল খাবোনা"! "কাল মেঘ দেখবোনা!!"…ইত্যাদি কথা বার্ত্তায় ও নবীন বিদেশিনীর!! গানে লোকের মনোরঞ্জন কল্লেন।

বদন অধিকারীর দলেরও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল। রাধামাধব কর উল্লেখ করেছেন 'বদন অধিকারী যখন গান ধরিত :

> ''রাই, মিছে গাঁথ মিনি সুতোর হার। যার জন্য গাঁথ হার, সে করেছে পরিহার,

আর ত ব্রজে আসিবে না সে ব্রজবিহার"

তখন দর্শক মণ্ডলী চঞ্চল হইয়া আহা, আহা করিয়া রাইয়ের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিত। নাচ গানের উপর যাত্রার দল খুব ঝোঁক দিত। ঝোড়োর দল 'কমলে কামিনী' পালার জন্য সর্ব্বেই বাহবা পাইত।...বৌ মাষ্টারের দল 'ধ্রুবচরিত্র' পালা গাইয়া আপামর সাধারণের মনোরঞ্জন করিত।'^{৫১}

দিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ) জানিয়েছেন :

'গৃহপ্রাঙ্গণে যে যাত্রা প্রভৃতির আয়োজন হইত তাহাতে যোগদান করিবার অধিকার আপামর সাধারণ সকলের ছিল। দরজা বন্ধ করিয়া কড়া পাহারা রাখিয়া কাহাকেও প্রবেশ করিতে না দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত।'^{৫২}

সুতরাং এসব নাচগানের পৃষ্ঠপোষক ধনী বাবুরা হলেও দর্শক এবং শ্রোতা ছিল এই ধনীদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণও।

লোকসংস্কৃতির ধারাগুলি পারস্পরিক এক অন্তর্লীন সম্পর্ক-সূত্রে গ্রথিত ছিল। তাই যাত্রার মধ্যে স্বচ্ছন্দে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল খেমটা নাচ। সমালোচক বলছেন :

> 'উনিশ শতকের মধ্যভাগে, চন্দননগর, চুঁচুড়া অঞ্চল হইতে যাত্রায় খেমটা নাচের প্রচলন হয়।... কেশে ধোপা ঐ খেমটা নাচ শিখিয়া গোপালের (সে যুগের বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা গোপাল

উড়ে) মালিনীর (বিদ্যাসুন্দর পালায়) নাচে যাত্রায় খেমটার প্রচলন করেন।'^{৫৩}

কিন্তু কালক্রমে পাশ্চাত্য নীতিবাগীশদের শুচিবায়ুর ফলে এখানেও একটা বড় আঘাত লাগে। যাত্রা সম্বন্ধে শিক্ষিতের উন্নাসিকতা তাকে পিছনের সারিতে ফেলে আসতে চায়। যে গোবিন্দ অধিকারী উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সম্ভ্রান্ত ঘরে আপ্যায়িত হতেন, তিনিই পরে বন্তির গোয়ালাদের পৃষ্ঠপোষকতায় জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন, তেমনই যাত্রাজগতের এককালের তারকা গোপাল উড়ে (১৮১৭-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ) সম্বন্ধে পরবর্তীতে শিক্ষিত ভদ্রলোকের বক্তব্য ছিল এরকম :

'ভদ্রলোকের বাটীর ভিতর গোপাল উড়ের যাত্রা দেওয়া কোন্ যুক্তির অনুসারী কার্য? এই যাত্রার সকল অঙ্গই প্রায় আদিরস ঘটিত। বিশেষতঃ যখন মালিনী আইসে তখন কোন ভদ্রলোক অনাবৃত কর্ণে বসিয়া স্থির থাকিতে পারেন?'^{৫8}

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সংস্কৃতি এতকাল সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রমোদের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল, যার জন্যে ধনীরা অজস্র অর্থব্যয়ে কুষ্ঠিত হননি, তা-ই একসময় অশ্লীল অমার্জিত রুচিহীন বলে বাতিল হয়ে যেতে শুরু করল। পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতি ও রুচির অভিঘাতে এবং বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর প্ররোচনায় বাঙালি তার পরম্পরাগত শৈল্পিক ঐতিহ্য হারাতে লাগল। এমনকি অষ্টাদশের শেষ থেকে উনবিংশের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাগবাজারে বিখ্যাত যে পক্ষীর দলের আড্ডা ছিল, যেখানে পক্ষীরা শিবচন্দ্র ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে নেশার আকাশে উড়তে শিখতেন, সেই আড্ডাটিও কুরুচি এবং অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হুতোম সেই বিষয়ে উল্লেখ করেছেন:

'এখন আর পক্ষীর দল নাই, গুখুরি ও ঝকমারির দলও অন্তর্ধান হয়ে গ্যাচে, পাখীরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন, দু-একটা আধমরা বুড়োগোছের পক্ষী এখনও দেখা যায়, দলভাঙ্গা ও টাকার খাঁকতিতে মনমরা হয়ে পড়েছেন, সুতরাং সন্ধ্যার পর ঝুমুর শুনে থাকেন। আড্ডাটি মিউনিসিপ্যাল কমিশনারেরা উঠিয়ে দেছেন, এখন কেবল তার রুইন মাত্র পড়ে রয়েছে।'

লোকসংস্কৃতির ধারাগুলিকে হাতে মারতে না পেরে ভাতে মারার পন্থা গৃহীত হয়েছিল। ভদ্রসমাজ আন্তে আন্তে এসব থেকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার করছিল। কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন সেই সময়ের সংবাদপত্র থেকে জানা যাচ্ছে কেমনভাবে শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কথকতার প্রাদুর্ভাব কমতে শুরু করেছিল। সেখানে লেখা হচ্ছে: 'সুশিক্ষিত দলে ইহা আর অধিকার পায় না, এক্ষণে কেবল অশিক্ষিত দল হইতেই কথঞ্চিৎ ইহার জীবন রক্ষা হইতেছে। অশিক্ষিত দলের মধ্যে কেবল স্ত্রী ও নীচ লোকেরাই ইহার অধিকতর ভক্ত।'^{৫৬}

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। তা হল উনিশ শতকের এই সাংস্কৃতিক শ্রেণিবৈষম্য শুধু যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বা ভদ্রলোক-ছোটলোক ভেদে বিদ্যমান ছিল তা নয়, এই শ্রেণিবৈষম্য ছিল সদর আর অন্দরের মধ্যেও। তথাকথিত শিক্ষিত সম্রান্ত বাবুদের সদরের সঙ্গে অন্দরের মিল প্রায় ছিল না বলা যেতে পারে। সদরে যখন নির্বিচারে দেশজ সংস্কৃতির নিধনপর্ব চলছিল, তখনও অন্দরে প্রবাহিত ছিল পাঁচালি, কথকতা বা ঝুমুরের লৌকিক আমোদের রঙ্গপ্রোত। বিশেষত বাঙালির অন্দরমহলে বাইরের হাওয়া বয়ে আনত ঝুমুরওয়ালি, বৈষ্ণবী, মালিনি, মেয়েকবি ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাধীন বৃত্তিজীবী নারীরাই। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে তার নিদর্শন আছে। দেবেন্দ্র হরিদাসী বৈষ্ণবী বেশে নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে শ্রোত্রীগণ তাকে যা যা ফরমায়েশ করেছিলেন তা থেকেই সমকালের মহিলাদের পছন্দ-অপছন্দের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। কারণ:

'কেহ চাহিলেন, "গোবিন্দ অধিকারী"---কেহ "গোপাল উড়ে।" যিনি দাশরথির পাঁচালী পড়িতেছিলেন, তিনি তাহাই কামনা করিলেন। দুই একজন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা "সখীসংবাদ" এবং "বিরহ" বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন "গোষ্ঠ"-কোন লজ্জাহীনা যুবতী বলিল, "নিধুর টপ্পা গাইতে হয় ত গাও-নহিলে শুনিব না।"

আবার এদের হাত ধরেই বটতলা অনুপ্রবিষ্ট হত ভদ্রঘরের অন্দরমহলে। স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ) জানাচ্ছেন :

'মনে আছে বাড়িতে মালিনী বই বিক্রী করতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কিরকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য, উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প-ইহার সংখ্যাই যদিও অধিক-অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত...।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অন্দরমহলেও বটতলার বইয়ের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। কিন্তু তথাকথিত নিম্নবর্গের মহিলাদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা এবং অসংস্কৃত আমোদের নেশা ভদ্রঘরের অন্তঃপুরকে কলঙ্কিত করে ফেলবে, এসব কারণেই ক্রমশ ভদ্রলোকেরা শিক্ষিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের মনের সেই শক্ষা ধরা আছে সংবাদপত্রের পাতায়। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে :

> 'কৃষ্ণলীলা রাস ও বস্ত্র হরণাদি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অশিক্ষিত যুবতীর চিত্ত অবিচলিত থাকা সম্ভাবিত নয়।'^{৫৯}

অন্তঃপুরের শুচিতা রক্ষার নামে জনপ্রিয় লোকগাথাগুলির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছিল এই বলে যে, এগুলি মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এভাবেই পরবর্তী কোপ এসে পড়েছিল মেয়ে-কবি, মেয়ে-পাঁচালিকার, ঝুমুরওয়ালিদের ওপর। মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানাচ্ছেন:

'তখনকার দিনে মেয়েদের কার্য উপলক্ষে মেয়ে-পাঁচালীর প্রথা ছিল অর্থাৎ মেয়ে-যাত্রার দল। তারা নিজেরাই সাজিত আর ভাঁড়ের পালা করিত।...কিন্তু মেয়ে পাঁচালী বেশীদিন চলিল না। শিক্ষিত লোকেরা নিন্দা করিতে লাগিল ও উঠিয়া গেল।'^{৬০}

শিবনাথ শাস্ত্রীও জানাচ্ছেন:

'ইংরাজী শিক্ষা দেশমধ্যে যখন ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তখন হইতে এই সকলের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিতৃষ্ণা জন্মিতে লাগিল।'^{৬১}

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে অশ্লীলতা বিরোধী আইন পাস হবার পর শুধু সাহিত্য নয়, কবিগান, যাত্রা, সং, পাঁচালি, তরজা, ঝুমুর ইত্যাদি লৌকিক সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিও কড়া নজরদারির আওতায় আনা হয়। আসলে ঔপনিবেশিকতার সূত্র ধরে এদেশীয় ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির মানসিকতার ওপরে ইংরেজের নৈতিক আদর্শ বহুল পরিমাণে ছায়াপাত করেছিল। এ সমাজে খেউড় লহরে ভরা আখড়াই বা কবির লড়াই, প্রণয়-প্রাচুর্যে ভরা 'মদন আগুন' এর প্রাধান্যে পরিপূর্ণ যাত্রাপালার চাহিদাকে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা মানতে পারেননি। সেকালের সংবাদপত্র থেকে তার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে। ভদ্রলোকেরা আপত্তি করেছেন এই বলে যে:

'পাঁচালী ও যাত্রার দলের লোকেরা…হাজার দুই হাজার লোকের সম্মুখে অম্লান বদনে অকুষ্ঠিত মনে মুখে যাহা আইসে তাহাই বলে, সুর তাল মানের সঙ্গে অতিশয় কুৎসিত গান গাইতে এতটুকু লজ্জাবোধ করে না…।'^{৬২}

আর শিক্ষিতের অনুগ্রহ-পুষ্ট সংবাদপত্রে স্পষ্টই দাবি করা হয়েছে 'কবি ও খেউড়ের সদৃশ অশ্লীল বিনোদন কদাপি বহুকাল ভদ্রসমাজে সমাদৃত থাকিতে পারে না' কারণ 'জ্ঞানালোকের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দূষ্যবোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।'^{৬৩} আবার বিদ্যাসুন্দর এর কুরুচিপূর্ণ গান জনচিত্ত ঘৃণিত ও অপবিত্র

করার দায়ে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় যথেষ্ট নিন্দিত হয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন'-এ যাত্রাগানের সমালোচনায় বলা হয়েছিল :

'যে কেহ কথার মিল করিতে পারিল, সেই মনে করিল গীত গাঁথিলাম। যাত্রাকর তাহা গান করিয়া ভাবিলেন আমি গীত গাইলাম। শ্রোতারা মনে করিলেন আমরা গীত শুনিলাম।...আধুনিক যাত্রার দোষে কৃষ্ণ রাধাকে গোয়ালা বলিয়া বোধ হয়, পূর্বে কবির গুণে দেবতা বলিয়া বোধ হইত।'^{৬8}

আবার 'এডুকেশন গেজেট'-এ ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারে নীলদর্পণ নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিল :

> 'যাহাতে বঙ্গদেশের মধ্যে অশ্লীল ও অসভ্য আমোদসকল দূরীভূত হইয়া, বিশুদ্ধ ও নির্দোষ আনন্দ প্রচলিত হয় তজ্জন্য আমাদের সর্বতোভাবে যত্ন করা কর্তব্য।'^{৬৫}

শুধু সংবাদপত্রের পাতায় নয়, আরও বিভিন্ন রচনার মধ্যেও প্রচলিত আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব ধরা আছে। রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ) অনুদিত 'রত্নাবলী'র ভূমিকাটি তার পরিচয়বাহী। যখন যাত্রার পরিবর্তে থিয়েটারকে স্বাগত জানানো হচ্ছে তখন বাংলায় উপযুক্ত নাটকের অভাবে শিষ্ট শুদ্রজন নিজ স্বার্থেই সংস্কৃতের নাট্য-ভাঞ্জারে হাত দিয়েছে। আর প্রচার করেছে :

> 'সরস সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষার নাটকসমূহের অতুল্য রসমাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়া পড়িয়াছে। নির্ম্মল সুধাকর বিনিঃসৃত সুধাধারের আস্বাদ পাইলে কাঞ্জিকাতে কাহারও অভিরুচি হয় না।'^{৬৬}

যাত্রার বদলে থিয়েটারকে আপন করে নেওয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উৎসাহিত কণ্ঠস্বর আজও পুরোনো সংবাদপত্র খুঁজলে চোখে পড়ে। 'নবপ্রবন্ধ' পত্রিকায় 'নাটকাভিনয়' প্রবন্ধে (আগস্ট ১৮৬৭) যেমন লেখা হয়েছিল :

> 'এরূপ আমোদ যে পূর্ব্বকালীন জঘন্য হাপ-আকড়াই ও পাঁচালী অপেক্ষা মঙ্গলজনক তাহার আর সন্দেহ নাই।'^{৬৭}

অথচ এককালে এই হাফ আখড়াই আট থেকে আশি সকলের মনোরঞ্জন করত অবলীলায়। হুতোমের বিবরণ থেকে তার রসগ্রাহী বর্ণনা মেলে :

> 'সহরে ঢি ঢি হয়ে গ্যাছে, আজ রাত্তিরে অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পূজোয় হাফ আকড়াই হবে। কি ইয়ারগোচের স্কুল

বয়, কি বাহাতুরে ইনভেলিড, সকলেই হাফ আকড়াই শুনতে পাগল! বাজার গরম হয়ে উঠলো। '৬৮

কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপে এসব আমোদ-প্রমোদ নিজেদের পায়ের তলার জমি হারাতে থাকে। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা 'বাংলা লোকসংস্কৃতিকে একটা অস্বস্তিজনক ব্রণ ভেবেছিলেন, যেটা তাঁরা তাঁদের নব্য পরিশীলিত, পাশ্চাত্য শিক্ষার অঙ্গরাগে রঞ্জিত সাংস্কৃতিক মুখাবয়বে ঘষে মেজে মসৃণ, বা ঐ মুখ থেকে একেবারে নির্মূল করে দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। '৬৯ সভ্যতা প্রসারের ছল করে দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর হানা হয়েছিল প্রবল আঘাত।

শিক্ষিত ভদ্রলোকদের অতিরিক্ত উৎসাহে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে কাঁসারিপাড়ার বিখ্যাত সঙের মিছিল বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল পুলিস কমিশনার হগ সাহেবের নেতৃত্বে। সঙ ছিল সেকালের অত্যন্ত লোকপ্রিয় আমোদ। তার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির যথেচ্ছাচারকে ব্যঙ্গ করা হত। সঙগুলির নাম থেকেই বিষয় এবং উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হয়না। 'বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেন্তন', 'খ্যাঁদা পুতের নাম পদ্মলোচন', 'বকা ধার্মিক ক্ষুদ্র নবাব', 'হাড় হাবাতে মিছরির ছুরি' এসব দেখে সাধারণ জনতা হাসির হুল্লোড়ে ভেসে যেত। ক্ষমতাশালীদের বিরুদ্ধে নিতান্ত সাধারণদের এ এক অভূতপূর্ব প্রতিবাদ, যার বাইরের মোড়কে আছে ব্যঙ্গের রং-চং। বৎসরান্তে একটি দিন এই সঙ্কের মিছিল বার হত। তাতে বহু লোকের মনোরঞ্জন হত। তার ওপর হামলার প্রতিবাদে সঙ্কেরা বড চমৎকার কথা বলেছিলেন :

'এত গরিব লোকের আমোদ বড় সভ্যতার মাথাব্যথা।... যদি ইহা এত মন্দ মনে ভেবে থাকো, নিজের মাগ্কে চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখ।'^{৭০}

সেকালের বাঙালির মন ছিল নানা দ্বান্দ্বিকতায় আচ্ছন্ন। মগজ ধোলাই এর নানা অভিঘাতে পর্যুদস্ত। সুতরাং বেশ কিছু ক্ষেত্রে স্ববিরোধে ভরপুর। যেমন আগে খেমটা নাচের কদর ছিল যথেষ্ট। যদিও সর্বক্ষেত্রে সুরুচি বজায় থাকত না, কিন্তু তার জন্য যদি কেউ দায়ী হয় তাহলে দায়ী হবে দর্শকের রুচি, তারই নিরিখে খেমটার এই পরিণতি। শ্যামলী চক্রবর্তী (১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ) যথার্থই বলেছেন:

'আসলে প্রাচীন সামন্ততন্ত্র ও নব্য বণিকতন্ত্র মিলে তৈরী হয়েছিল উনিশ শতকের নতুন শহুরে 'বাবু কালচার'। এই কালচার দেশজ সংস্কৃতির গভীর ভূমি ফেলছিল হারিয়ে।'^{৭১} খেমটার মত নাচ বাবুদের বিনোদনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছিল ঠিকই, কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে বাবুদের রুচির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে তার শিকড় থেকে উচ্ছেদও ঘটছিল। হুতোমের রচনায় এই বিষয়ে সম্যুক বিবরণ মিলেছে:

'খ্যামটা বড় চমৎকার নাচ। সহরের বড় মানুষ বাবুরা প্রায় ফি রবিবারে বাগানে দেখে থাকেন। অনেক ছেলে পুলে, ভাগ্নে ও জামাই সঙ্গে নিয়ে, একত্রে বসে-খ্যামটার অনুপম রসাস্বাদনে রত হন। কোন কোন বাবুরা স্ত্রীলোকদের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান---কোনখানে কিস্ না দিলে প্যালা পায় না---কোথাও বল্বার যো নয়!'^{৭২}

এসব কারণেই তা বিকৃতরুচির পরিপোষক হিসেবে তথাকথিত ইংরেজ-ভক্ত অশ্লীলতা-বিরোধী ভদ্র-শ্রেণির রোষানলে পড়ে যায়। সেকালে খেমটার পাশাপাশি বাঈনাচেরও যথেষ্ট কদর ছিল। কিন্তু অশ্লীলতা-বিরোধী অভিযানে খেমটার দুর্দশা হলেও বাঈনাচ সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। খেমটার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা হলেও বাঈনাচকে প্রকারান্তরে সমর্থন করা হয়েছিল। সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল:

'নীচ ভাবোদ্দীপক জঘন্য খ্যামটা নাচ সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা একটা প্রধান লক্ষ লওয়া উচিত। বাঈ নাচ থাকিলে ক্ষতি নাই।'^{৭৩}

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন কেমনভাবে আমদানি করা সভ্যতার অভিমানে খেমটা নাচকে মনে হয়েছিল নীচ ভাবোদ্দীপক জঘন্য অঙ্গভঙ্গি, অথচ বাঈজী নাচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার পৌরাণিক গাম্ভীর্য আর বনেদী উৎসের জন্য পার পেয়ে গিয়েছিল। তেমনি হিন্দুস্থানি সঙ্গীত বিশেষ মর্যাদা পেলেও লোকগানকে চিহ্নিত করা হয়েছিল 'melody of confusion and noise' বলে। সম্রান্ত ও বিদপ্ধ সঙ্গীত রসিক সমাজে খাঁটি বাংলার লোকগানের মর্যাদা আর ছিল না। ক্রমে ভদ্রলোকেরাই শিক্ষা সংস্কৃতির অভিমানে এসব গানকে অপর বা অন্তেবাসীর আমোদের সামগ্রী বলে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন।

তবে যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা বিতর্কে উনিশ শতকের কলকাতার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট উত্তাল, তা এত সহজে সমাপ্ত হয়ে যায়নি। আসলে বহতা সময়ের স্রোতে উনিশ শতকের কলকাতার নাগরিক সমাজ অশ্লীলতা বিষয়টি নিয়ে নানা বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে থাকে। নানাবিধ নতুন নতুন সমস্যাও উঠে আসতে থাকে। প্রথমে মনে করা হয়েছিল নতুন নাটকের আবির্ভাবে বঙ্গভূমির তথাকথিত অশ্লীল আমোদ-প্রমোদ দূর হয়ে যাবে, সুস্থ রুচির বিনোদনে নির্মল হয়ে উঠবে পরিপার্শ্ব। কিন্তু এই নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গেই সুরুচি এবং সুনীতির ধারক ভদ্রসমাজে আর এক নতুন

বিপদের উদ্রেক হয়। নাটকে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করার ক্ষেত্রে ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক পাওয়া তখন অসম্ভব ছিল। সুতরাং অভিনেত্রী সংগ্রহ করতে হত মূলত বেশ্যাদের মধ্যে থেকে। এর ফলেই ভদ্রসমাজে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। আসলে বারাঙ্গনারা যখন তথাকথিত ভদ্র-শ্রেণির সাংস্কৃতিক বৃত্তে প্রবেশ করতেন, তখনই রীতিমতো আপত্তি উঠত। নাট্যশালায় অসম্মানিত স্ত্রীলোকের আনাগোনা একটা অনর্থের মূল হিসেবেই পরিগণিত হয়েছিল। বেশ্যাদের সঙ্গে একমঞ্চে ভদ্রঘরের পুরুষদের অভিনয় অনেকেই ভালোভাবে মেনে নিতে পারেননি। মনোমোহন বসুর (১৮৩১-১৯১২ খ্রিস্টাব্দ) একটি মন্তব্যেই তা স্পষ্ট :

ভদ্রযুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে একত্র সাজিয়া রঙ্গভূমিতে রঙ্গ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে নৃত্য করিবেন ইহাও কি কর্ণে শুনা যায়?'

এবং তখন তাঁদের মত ভদ্রলোকদের মনে হতে থাকে এর চেয়ে তো যাত্রাওয়ালাদের 'জঘন্য' পালাগুলিও কম বিপদজনক ছিল, তাতে অন্তত বেশ্যার সঙ্গে মঞ্চভাগ করা হত না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে উনিশ শতকের শিষ্টবর্গের মানসিকতার টানাপোড়েনে জর্জরিত হয়েছে বিনোদনের মাধ্যমগুলি। তাদের নিজেদের রক্ষণশীলতা এবং প্রগতিশীলতার দ্বন্দে দাবার বোড়ে হয়ে উঠেছে এগুলি। তাদেরই চাহিদায় এই বিনোদন মাধ্যমগুলি কখনো হয়ে উঠেছে আকাঞ্জিত, আবার কখনো ব্রাত্য।

উনিশের দ্বিতীয়ার্ধের কলকাতায় উচ্চ আর নিম্নবর্গের সংঘাতের শিকড় সন্ধান করতে গিয়ে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন :

'উনিশ শতকের কলকাতার নিম্নবর্গের মানুষের অধিকাংশই এসেছিলেন তাঁদের গ্রামীণ পৈত্রিক পেশা ও ভিটে থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে। শহরের নতুন রীতি-নীতি, হাবভাবের সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে গিয়ে প্রতি পদেই হোঁচট খেতেন। 'ভদ্রলোক'দের কাছ থেকে শুনতে হত গালাগালি---'ইতর', 'ছোটলোক', 'গেঁইয়া'। গরিব বলে কি তাঁদের আত্মসম্মানবোধ ছিল না? এ অপমানের প্রতিশোধ নেবার একমাত্র উপায় ছিল ঐ উন্নাসিক 'ভদ্রলোকদের' নাকে-কানে খত দেওয়ানো-যেটা বাস্তবে সম্ভব ছিল না। তাই বিদ্রূপাত্মক প্রবাদে, গানে, কবির লড়াই-এর খেউড়ে, পাঁচালিতে, সঙ্-এর মিছিলে, সে যুগের কলকাতার রাস্তায় আর বাজারে শহরের এক দরিদ্র, অপাংক্তেয় মানুষেরা তাঁদের অবরুদ্ধ ক্ষোভ প্রকাশ করার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।' বিভ

সমালোচক আরও বলেছেন:

'প্রধানত সমাজ-সংস্কারের প্রয়াসজনিত কারণ এবং প্রাচীন রক্ষণশীল মনোভাব ও নবজাগ্রত উদগ্র সংস্কারপন্থী তাগিদ---এ দুয়ের ঘাত-প্রতিঘাতের উত্তেজনামুখর চাঞ্চল্যকর পরিবেশেই উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলার কৌতুক ব্যঙ্গ-বিদ্রাপাত্মক রচনার জন্ম।'⁹⁹

সুতরাং এই ব্যঙ্গ বা পরিহাসটাই হয়ে উঠেছিল তাঁদের অন্যতম অস্ত্র। যেমন তোষামোদে ভরা পেট, অথচ প্রত্যাঘাতের বারুদ বুকে নিয়ে কবিওয়ালারা গড়ে তুলেছিলেন এক অন্যরকম প্রতিবাদ, গানে গানেই যার পরিচয় মেলে। তথাকথিত ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হলেও কবিওয়ালারা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করতেন এবং প্রয়োজনে পৃষ্ঠপোষকদের উচিত কথা শুনিয়ে দিতেও পিছপা হতেন না। যেমন ভোলা ময়রা কোনো এক কবিগানের আসরে গৃহকর্তার কৃপণতা বিষয়ে গেয়েছিলেন :

'পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুকতের মধু অলি। মাপ কর গো রায় বাবু, দুটো সত্য কথা বলি।'^{৭৮}

শুধু তাই নয়, যেখানে সুযোগ পেতেন সেখানেই উচ্চবর্গের নৈতিক অধঃপতন এবং অনাচারকেও তীব্র বিদ্রূপ করতেন লোককবিরা। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন :

'গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ সেযুগের কলকাতার নিম্নবর্গের মানুষ মেনে চলতেন অনেকাংশে।
তাই নব্য-ধনীদের জাতে ওঠার প্রতিযোগিতাকেও যেমন তাঁরা
বিদ্রেপ করতেন, একই সঙ্গে সমাজ-সংস্কারকদের কাজকর্মও
(যেমন বিধবা-বিবাহ বা স্ত্রী-শিক্ষার প্রচেষ্টা) তাঁরা উপহাস
করতেন তাঁদের গানে ও কবিতায়। সামাজিক সংস্কারের
আন্দোলনকে তাঁরা ইংরেজি শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতির
আরও পাঁচটা কুফলের মতোই (জাত বিসর্জন দিয়ে 'বাবু' হবার
প্রতিযোগিতা, অর্থের লোভে স্বজন-পরিজন ত্যাগ করা, মদ্যপান
ও বারাঙ্গনা-গমন ইত্যাদি) সন্দেহের চোখে দেখতেন।'

মনে রাখতে হবে কলকাতার নব্য-ধনী সম্প্রদায়ের অনেকেই উঠে এসেছিলেন তথাকথিত নিম্নবর্ণ থেকে। বিত্তগত কৌলীন্যের জোরে সমাজে স্থান করে নিয়েছিলেন। বনেদি উচ্চবর্গের সঙ্গে তাঁদের তফাৎও ছিল। এতকালের বর্ণ-বিভাজিত সমাজের কাঠামো তাঁরা টাকার জোরে নস্যাৎ করে দিচ্ছিলেন। 'কালীপ্রসাদী হাঙ্গামা' উপলক্ষে কলকাতার বুকে ওঠা আলোড়ন এই ঘটনার সাক্ষ্য দেয়। হাটখোলার কালীপ্রসাদ দত্ত বিবি আনার নামে এক মুসলিম উপপত্নী রাখলে তাঁকে জাতিচ্যুতির হুমকি দেওয়া হয়।

সেকালের কলকাতায় তখন এসব ধর্মীয় আর সামাজিক ব্যাপারের প্রধান দলপতি ছিলেন শোভাবাজার রাজবাড়ির নবকৃষ্ণ দেব, আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দলে ছিলেন উঠিত ধনী রামদুলাল দে। কালীপ্রসাদ এই ঘটনার নিষ্পত্তির জন্য রামদুলালের শরণ নিলে তিনি শহরের ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অর্থ দিয়ে সম্ভুষ্ট করার উপায় বলে দেন। আর এই উপায় অবলম্বন করে কালীপ্রসাদ পুনরায় জাতে উঠে আসেন। অতীতের ফেলে আসা সামাজিক কাঠামোর এতখানি বিপর্যয় মেনে নেওয়া সাধারণ জনতার পক্ষে সম্ভব ছিল না, আর লোককবিরা যেহেতু এদের মধ্যে থেকেই উঠে এসেছিলেন কাজেই তাদের চোখে এসব অনাচার হিসেবেই বিবেচিত হয়েছিল। নতুন শহরের নতুন নাগরিকের চিন্তাধারা তাদের প্রচলিত চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। আর নতুন যুগের নতুন সংস্কারকদের চিন্তাধারাও তাদের অপছদের তালিকায় পড়েছিল। সুতরাং দ্বন্দ্ব জমে উঠতে দেরি হয়নি। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন:

'সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়, ধনী অভিজাতবর্গের ও 'বাবু'দের কেতা-কানুন, হাব-ভাব, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি নিয়ে লোকসঙ্গীত, ছড়ায়, বটতলার সাহিত্যে ও সঙ-এ হাস্য-কৌতুকের মাধ্যমে এক ধরনের group identity বা নিজস্ব গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের চেষ্টা দেখা যায়। নব্য-শিক্ষিতরা, ধনীরা---এরা আলাদা ধাঁচের মানুষ। এদের শিক্ষা ও অর্থের গর্বকে ভাঙবার জন্য এবং ঐ বিষয়ে নিজেদের হীনম্মন্যতাভাব অতিক্রমের জন্য লোকশিল্পীদের প্রয়োজন ছিল বিদ্রূপের মাধ্যম। এই শিক্ষিত, ভদ্রলোক সম্প্রদায় বাইরের গোষ্ঠী। তাই তাদের আচার-আচরণকে হাস্যকরভাবে অতিরঞ্জিত করে হীন প্রমাণ করার প্রবণতাটা এত তীব্র।' চিত

যুগের চেয়ে অগ্রগামী পুরুষ, ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক মানুষ হিসেবে খ্যাত রামমোহন রায়কে অবধি বিদ্রূপ করে তারা ছড়া বেঁধেছিলেন :

> 'সুরাই মেলের কুল, বেটার বাড়ী খানাকুল, বেটা সর্ব্বনাশের মূল, ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে ইস্কুল, ও সে জাতের দফা, করলে রফা মজালে তিন কুল।'^{৮১}

বিখ্যাত ধনী দর্পনারায়ণ মল্লিক ডাকাতের ভয়ে নিজের বাড়ির চারিদিকে মস্ত প্রাচীর তৈরি করলে তাই নিয়েও কলকাতার লোক-কবিরা ছড়া বেঁধেছিলেন :

'কায়েত মরে খেয়ালে বেনে মরে দেয়ালে'^{৮২}

কারণ দর্পনারায়ণ ছিলেন সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাহলে দেখা যাচ্ছে নানা দিক থেকে এই উচ্চ এবং নিম্নবর্গের ভেদ উনিশ শতকে এক ভিন্ন মাত্রা নিচ্ছিল। শুধু যে লোকসংস্কৃতির নানা ধারায় এই সংঘাতের ইতিবৃত্ত রচিত হচ্ছিল তা-ই নয়, জনতার সাহিত্যের দরবারেও তা আলোড়ন তুলেছিল। আর এই সংঘাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল নতুন যুগের নব্য শিক্ষা। এই শিক্ষার পরিধির মধ্যে থাকা মানুষগুলোর সঙ্গে এই পরিধির বাইরের মানুষগুলোর ক্রমবর্ধমান দূরত্ব পারস্পরিক বিশ্বাসের বাতাবরণকে প্রশ্নের মুখে ফেলছিল বারংবার। অদ্রীশ বিশ্বাস বলছেন:

'উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের একটা খুব বড়ো জায়গা শিক্ষাকেনদ্র এবং তৎসংশ্লিষ্ট বন্দোবস্ত।...শিক্ষিতরা জানে বলে 'জ্ঞানী' এবং সেই 'জ্ঞান-ক্ষমতা' দ্বারা অশিক্ষিতদের দমন করে, হেনস্থা করে, প্রতারণা করে, অবজ্ঞা করে। এককথায় শোষণ করে বলা যায়। এই শোষিত সাধারণ মানুষ বটতলার এই পুস্তিকায় সুযোগ পেয়েই আক্রমণ করেছে অপদস্থ করেছে শিক্ষিত 'উচ্চ' অবস্থানকারীদের, যেভাবে সে অপদস্থ হয়ে থাকে তাদের হাতে।' চত

দ্বি তীয় পরিচ্ছে দ ভাষা প্রকল্পের রাজনীতি

ভাষার ক্ষেত্রেও অতীতাশ্রয়ী সংস্কৃত ঘেঁষা 'ইতরজনের দুরধিগম্য' ভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। সমালোচক মৃণাল নাথ বলেছেন :

> 'উপনিবেশের সবচেয়ে বড় অবদান হল বাংলা ভাষাকে ভদ্রস্থ করার প্রয়াস। অর্থাৎ ভদ্রায়ণ প্রক্রিয়া। উনিশ শতকে ইংরেজের সংস্পর্শে এসে শিক্ষিত বাঙালিরা তা শুরু করেছিলেন।'^{৮৪}

হুতোম বলেছিলেন বাংলা ভাষাটা 'বেওয়ারিশ লুচির ময়দা', তাকে নিয়ে যে যা ইচ্ছে করছে। ভাষা ও সংস্কৃতির পবিত্রতা রক্ষার নাম করে বাংলা ভাষাকে তার স্বাভাবিক ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা এবং প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। অনিন্দিতা ঘোষ যথার্থই বলেছেন :

'ভাষার সংস্কৃতায়ন, কথ্য ভাষার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা এবং অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট সমস্ত প্রকার সাহিত্য ও লোককলা বর্জনের প্রবণতার দ্বারা উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি গড়ে তোলে তাদের আদর্শ সাহিত্যসম্ভার।' দ্ব

প্রতি সমাজেই তার ক্ষমতাশালী শ্রেণির ব্যবহৃত ভাষাই সেই সমাজের আদর্শ বা standard হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সংস্কৃতের ভারে বাংলা তার স্বচ্ছন্দ গতি হারিয়ে ফেলছিল। লৌকিক বাংলার সাবলীলতা তার মধ্যে আর পাওয়া যাচ্ছিল না। আসলে আর্য সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার তাগিদে একসময় ব্রাহ্মণ্য-নিয়ন্ত্রিত অভিজাত সমাজ সংস্কৃতের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। তথাকথিত সাধারণ জনজীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহারের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার কোনো যোগই স্থাপিত হয়েনি। বরং তাদের ভাষা থেকে দূরত্ব বজায় রাখার একটা সচেতন প্রয়াস লক্ষিত হয়েছিল। আর ইংরেজরা এদেশে রাজত্ব কায়েম করার পর থেকে এই সংস্কৃতয়েঁষা সাধু বাংলাই বাংলা গদ্যরীতির আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। এক্ষেত্রে ইংরেজ শাসক এবং মিশনারিদের যথেষ্ট অবদান ছিল। সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ) লিখেছেন:

'১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হালহেড এবং পরবর্তীকালে হেনরি পিটস্ ফরস্টার ও উইলিয়ম কেরি বাংলাভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবি-ফারসির অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতি করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই তিন ইংলন্ডীয় পণ্ডিতের যত্ন ও চেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যে বাংলা সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।' ৮৬

আর ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং তাকে ঘিরে বাংলা ভাষা চর্চার যে আবহ গড়ে উঠেছিল তাও মান্যতা দিয়েছিল সাধুরীতিকেই। অনিন্দিতা ঘোষের বক্তব্য তুলে ধরেছেন হার্দিকব্রত বিশ্বাস এই প্রসঙ্গে:

'প্রাচ্যবাদী সাহেব পণ্ডিত ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাজকর্মের প্রভাবে বাংলা ভাষার মোড়কটি সযত্নেই সংস্কৃত ঘেঁষা করে ফেলা হল। এই ভাষার স্থান আরও পোক্ত হল যখন থেকে মিশনারি আর আমলারা এর ব্যাপক প্রচার ও ব্যবহার শুরু করে দিলেন।' আর তার সমর্থনে জানাচ্ছেন : 'এক নতুন আত্মসচেতন বাঙালি জাতির কাছে এই ভাষার কদর বেড়ে তো গেলই আর ঔপনিবেশিক সমাজে নিজেদের জায়গা করে নিতে ভাষাকেও ব্যবহার করলেন অনেকেই।' দ্ব

ঠিক এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে জনসাধারণের দৈনন্দিন মুখের ভাষাকে ধারণ করে বটতলার সাহিত্য, যা জনপ্রিয়। অদ্রীশ বিশ্বাস জানাচ্ছেন :

'জনপ্রিয়তার সঙ্গে যে জনভাষার যোগ, তার মনস্তত্ত্ব প্রধানত দাঁড়িয়ে থাকে ভোক্তার ভাষা-ক্ষমতা বা ভাষা অধিকারের উপরে। চমক্ষি মনে করেন, এই ভাষা-গ্রহণটা উচ্চশিক্ষিত প্রস্তুত পাঠকদের মতো নয়, তাঁরা অজানা শব্দ ও ভাষা সম্বন্ধে আগ্রহী হয়, সেই ভাষাটা তারা জেনে নেয়-শব্দ-বাক্য-অর্থ জানার প্রবণতা তাদের শিক্ষার অর্জন পথের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে থাকে। অন্য দিকে, বৃহত্তর জনমানসে ভাষার সেই নতুনত্বের প্রতি অনধিকার ভয় কাজ করে। সে ভাবে, এই নতুন ভাষা-পৃথিবীটা তার জন্য নয়, বরং তাকে বিপর্যন্ত করার জন্য। তখন সে নিজেই প্রত্যাখ্যান করে ওই সাহিত্য বা টেক্সটকে। যা তার বোধগম্য তা গ্রহণীয়, এই তত্ত্ব মেনে জনপ্রিয় সাহিত্যের ভাষা গড়ে ওঠে।'

বটতলার লেখকেরা বানানবিধি এবং ব্যাকরণকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন বলে মনে হয় না। বরং মুখের চলতি কথাই উঠে আসত এসব লেখায়। দেশজ শব্দের প্রাধান্য দেখা যেত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখার একটা প্রবণতা দেখা যেত। মোটকথা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়াই ছিল আসল কথা। বটতলার সমসাময়িক কোনো রচনার সঙ্গে মিলিয়ে বটতলার রচনা পড়লে বোঝা যাবে দুই ভাষার তারতম্য। যেমন কৌতুক-শতক রচনায় রয়েছে:

'একজন কৌতুকী এক নাপিতকে কৌতুক করিয়া কহিল, "ওরে তুই কখনো বানরকে ক্ষৌরী করেছিস?" নাপিত উত্তর করিল, "না মশায়! তাতো কখনো করি নাই, তবে কি না আজ যদি আপনি আমার কাছে খেউরী হন, তা হলে আর আমার এ দোষ টুকী থাকে না"।"

এই রচনার সাবলীলতা অবশ্যই চোখে পড়ার মত। কথ্য ভাষার অনায়াস প্রয়োগে তা সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যদিকে শিষ্ট নাগরিক সাহিত্যের রাজপথে তখন সুসংস্কৃত গুরুভার শব্দের জয়যাত্রা :

> 'দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি, যদি কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে

হইবে। প্রান্তর পার না হইতেই সূর্যাস্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। '^{১০}

মনে রাখতে হবে মূলধারার সাহিত্যে তখন ধ্রুপদী সাধু গদ্যের হাতছানি। যদিও হুতোম তাঁর নকশায় খাস কলকাত্বাই বুলির অনবদ্য নমুনা রেখে গেছেন, কিন্তু সেই গদ্য শিষ্টবর্গের মান্যতা পায়নি। মুখের ভাষা আর সাহিত্যের ভাষার মধ্যে ফারাক তো ছিলই, কারণ মনে করা হত সাহিত্যের ভাষা এক আলাদা সন্তা। মননশীল ভাব ও ভাবনাকে ধারণ করার মাধ্যম। নিত্যদিনের কথোপকথনের ভাষায় তা প্রকাশ করা অসম্ভব। সমালোচক জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ) জানাচ্ছেন:

'নিছক মুখের কথার পণ্ডিতে নাম রাখেন অসাধু। সুসংস্কৃত সাধুভাষা, ব্যাকরণে প্রসাধনে সাজাব যতনে তবে তো কাজের কথা।...কেজো কথা নিত্যপ্রয়োজনীয়, কিন্তু সাধুসংসর্গে মুখে তোলা যায় না, শুনতে খারাপ তাই অশ্লীল। বইয়ের পাতায় পরিবেশনে পণ্ডিতের শুচিমার্গ।'৯১

এভাবেই সাহিত্যের ভাষা আর জীবনযাপনের ভাষার মধ্যে ফারাক বেড়েই চলেছিল। আর তার মধ্যেই ভাষার সংস্কৃতায়নের প্রাণপণ প্রয়াসে বাংলা ভাষাকে ঘিরে ধরছিল এক ভাষাগত কুসংস্কার। সেখানে দাঁড়িয়ে বটতলা ছিল খানিকটা হাঁফ ছাড়ার জায়গা, যেখানে ভাষার সতীত্ব-রক্ষার দায় বা চোখরাঙানি নেই। বটতলার এই ভাষা অনেকক্ষেত্রেই শিষ্টবর্গের কাছে বিবেচিত হয়েছিল অঞ্লীল হিসেবে। এই সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সুভদ্রকুমার সেন (১৯৩৯-২০০৯ খ্রিস্টাব্দ) বলছেন :

'ভাষা ব্যবহারে-বিশেষ করে শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের সংবেদনশীলতা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।...আর সেই কারণে সাহিত্যবিচারে শ্লীলতা বা অশ্লীলতা সম্পর্কে আমাদের সংবেদনশীলতার-ও বিবর্তন হয়েছে। কিছুকাল আগে পর্যন্ত এমন বহু বাংলা শব্দ সর্বজনব্যবহৃত ছিল যেগুলি ভব্য আলাপচারিতায় আদৌ ব্রাত্য ছিল না পরবর্তীকালে সেইসব শব্দ কলকাতার শিক্ষিত সমাজের puritanism এর দাপটে অশ্লীল বিবেচিত হয়ে বর্তমানে প্রান্তিক ব্যবহারে পর্যবসিত হয়েছে।'

তাছাড়া সেকালের নগর কলকাতার অধিবাসীদের কথনভঙ্গির সম্বন্ধে জানা যাচ্ছে 'কলিকাতা কমলালয়' রচনায়। সেখানে কলকাতায় আগন্তুক কলকাতানিবাসীকে বলছেন:

'ভাল মহাশয় শুনিয়াছি যে, ভদ্রলোকের মধ্যে অনেক লোক স্বজাতীয় ভাষায় অন্য জাতীয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া কহিয়া থাকেন...ইহাতে বোধহয় সংস্কৃত শাস্ত্র ইঁহারা পড়েন নাই'^{৯৩} ইত্যাদি।

বোঝাই যাচ্ছে এই ভাষায় যথেষ্ট আরবি-ফারসি শব্দের মিশেলও থাকত। মুসলমান শাসনের সূত্র ধরে যা কালের স্বাভাবিক নিয়মে বাংলার শব্দভাগুরে স্থান করে নিয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫২-১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ) যথার্থই বলেছেন :

'আমাদের দেশে সেকালে ভদ্র সমাজে তিনপ্রকার বাংলা চলিত ছিল। মুসলমান নবাব ও ওমরাহদিগের সহিত যে-সকল ভদ্রলোকের ব্যবহার করিতে হইত, তাঁহাদের বাংলায় অনেক উর্দু মিশানো থাকিত। যাঁহারা শাস্ত্রাদি অধ্যায়ন করিতেন, তাঁহাদের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত। এই দুই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ভিন্ন বহু সংখ্যক বিষয়ী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাংলায় উর্দু ও সংস্কৃত দুই মিশানো থাকিত।' ১৪

পরবর্তীতে শিষ্ট ভাষা ও সাহিত্যের কারবারীরা এই সমস্ত বর্জন করে সংস্কৃতের সুসন্তান হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও বটতলার বাংলায় সেই শুচিবায়ুর স্পর্শ ছিল না। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বটতলায় মুসলিম প্রকাশকদেরও যথেষ্ট রমরমাছিল। সেখান থেকেও রাশি রাশি চটি বই ছাপা হত। তবে প্রচলিত বাংলা ভাষার সঙ্গে এসব বইরের ভাষার কিছুটা পার্থক্য ছিল। রেভারেন্ড লঙ এসব বইকে চিহ্নিত করেছিলেন মুসলমান বেঙ্গলি বলে। লেখকেরাও নিজেরা অনেকক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন মুসলমানি বাংলা বলে। যেমন 'কেচ্ছা গোল বাছনওয়ার' এর রচয়িতা শ্রীমুনশী দানেশ জানিয়েছেন লোকের সুবিধার জন্য বইটি 'মোছলমানি বাঙ্গালা ভাসায় ঠীক কেতাব মাফিক তরজমা করানো হল।' ক্র আবার 'গোল হরমুজ কেতাব' এর নামপত্রে লেখক উল্লেখ করেছেন 'খায়েস হইল মেরা, বাঙ্গালায় তরজমা করা, সকলের বুঝিবার তরে।' ক্র পরবর্তীকালে এই ভাষারীতি বিষয়ে গবেষকরা নানা আলোচনা করেছেন। আনিসুজ্জামান একে বলেছেন 'মিশ্র ভাষারীতির কাব্য'। অন্যদিকে আহমদ শরীফ একে বলেছেন 'দোভাষী ভাষা' ইত্যাদি। কিন্তু ভাষারীতি কিছুটা ভিন্ন হলেও একথা অস্বীকার করা যাবে না যে এসব বইও সাধারণ বাঙালি পাঠকের মুখ চেয়েই রচিত। ভাষাগত মূল্যে তার অবস্থান যেমনই হোক না কেন, সামাজিক সাংস্কৃতিক দিক থেকে তার গুরুত্ব অবহেলার নয়। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন :

'বটতলার মধ্যে এক ধরনের 'ওরাল' বা 'কথ্য' সংস্কৃতি ছিল, যেটার মধ্যে এক ধরনের সাবলীলতা, স্বতঃস্কৃত্তা রয়েছে এবং একেবারে চাঁচাছোলা ভাষায় লেখা। সেটাকে কন্সাস সাব্ভার্সান না বলে, 'সাব্ভার্সান অফ আপার ক্লাস কালচার' বলা যায়।...এই ভাষাটাকে আমার মনে হয় ডিগ্ল্যামারাইজেশন অফ দা আপার ক্লাস কালচার।'^{৯৭}

উভয় গোত্রের ভাষারীতির তফাৎ এবং মান্যবর্গের কাছে বটতলার ভাষার গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক প্রদীপ বসু (১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ) একটি সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছেন:

'হাই কালচারের মতো বটতলারও কিছু নান্দনিক নিয়মকানুন আছে, যা আমরা পড়তে পারি না। হাইডেগার বলেছিলেন ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে হ্যাবিটেড অফ বিয়িং। যেখানে মানুষ বসবাস করে, থাকে। এই যে ভাষা আমরা ব্যবহার করি সেটাও তো আলোকায়নের ভাষাই। এই ভাষার মধ্যেই বাস করি আমরা। এই ভাষাই আমাদের আনকনশাসলি নিয়ন্ত্রণ করে। তার বাইরে যেতে পারি না বলে বটতলার ভাষা পড়তে পারি না। মানে বুঝি না।

আর আমাদের বুঝতে না পারার অথবা বুঝতে না চাওয়ার অক্ষমতাই বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়াকে আরও তরাম্বিত করে।

তৃ তীয় পরিচছে দ শিষ্টবর্গের চোখে বটতলা ও তার প্রকৃত স্বরূপ

'বটতলা আসলে কী? বটতলাকে ভূগোলের মানচিত্র পড়া উচিত নাকি বিশেষ ঐতিহাসিক সময়ের মুদ্রণের বয়নের ক্ষেত্র হিসেবে দেখা উচিত তা নিয়ে একাধিক মতামত আছে। বাংলা সাহিত্যে, প্রবন্ধে, ইতিহাস নিয়ে লেখালিখি বা কাব্যের কুলীন জগৎ উনিশ শতক থেকেই বটতলার থেকে আলাদা মান ও রুচির দাবি করে এসেছে। 'বটতলা'-র বা 'বটতলা মার্কা' মানেই বেশ কিছুটা নীচে পড়ে যাচ্ছে সেইসব বইপত্রের আদর।' কি বটতলার খোঁজ প্রসঙ্গে এমনই বক্তব্য হার্দিকব্রত বিশ্বাসের। আবার উনিশ শতকের বাংলা বই নিয়ে দীর্ঘকাল চর্চাকারী গবেষক আশিস খাস্তগীর বলেছেন :

'বটতলার বই-এই শব্দযুগ্ম আমরা নিন্দার্থেই শুনতে অভ্যস্ত। এর আড়ালে কাজ করছে এক ধরনের উন্নাসিকতা ও রক্ষণশীলতা। 'বটতলা-গন্ধী' বলে 'ভদ্দরলোকেরা' নাকে রুমাল চাপা দেন। জন্মলগ্ন থেকেই বটতলা অবিচারের শিকার। 'পথসাহিত্য', 'ভালগার' ইত্যাদি তার শিরোভূষণ।…কিন্তু উনিশ শতকে বাঙালির অবদমিত গোপন কামনা-বাসনাকে এই 'পথসাহিত্য'ই প্রকাশ করেছে, সাধারণ মানুষকে দর্পণে নিজের মুখ দেখতে শিখিয়েছে।'^{১০০}

আর একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে 'প্রায় যে-সব সামাজিক-সাংস্কৃতিক চলাচল গোঁড়া বা সংস্কারবাদী কারুর-না-কারুর চক্ষুশূল হয়েছে বিশেষ করে উনিশ শতকের মধ্যভাগের পর থেকে, সেইসব চাপান-উতার আর বিচারসভার আঙিনা এই সাহিত্য।'^{১০১} যদিও বহুকাল ধরেই বটতলার বই সম্পর্কে উচ্চবর্গের একটা ভ্রান্ত ধারণা শিকড় গেড়েছে। সুভদ্রকুমার সেন সেই বিষয়ে বলছেন :

'বটতলার বই সম্বন্ধে প্রচলিত প্রায় সর্বজনীন ধারণা---এ ধরনের বই কুলীন সাহিত্য পদবাচ্য নয়---যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এমন কথা বলা চলে না। তবে অনেক প্রচলিত ধারণার মতো এটিও চূড়ান্ত সত্য নয়, অর্ধসত্য মাত্র।'^{১০২}

তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলছেন :

'বটতলায় প্রকাশিত 'প্রহসন', 'সামাজিক প্রহসন' বা 'রংদার প্রহসন' জাতীয় কোনও কোনও রচনায় আদি রসের মাত্রা কিছু যে বেশি তা অস্বীকার করা যায় না।...এ-কথা বলতে চাইছি না যে, বটতলা প্রকাশিত প্রহসনগুলি অস্প্রীলতা বিবর্জিত নির্দোষ আমোদ উপভোগের বস্তু ছিল। বস্তুত অস্প্রীল বই আর সে বই যদি সচিত্র হত তো তার খুবই কাটতি ছিল। অস্প্রীল গ্রন্থ প্রকাশ নিবারক আইন কার্যকর হবার আগে এ ধরনের বই হাজার হাজার কপি ছাপা হত।'^{১০৩}

কিন্তু তারই পাশাপাশি এটা মনে রাখতে হবে, বটতলা থেকে কেবল 'অশ্লীল' বই-ই ছাপা হত তা নয়, অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের বইও বিপুল পরিমাণে ছাপা হত। সুভদ্রকুমার সেন আরও জানাচ্ছেন :

> 'বটতলার বই মাত্রেই অশ্লীল এই ধারণার পিছনে দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণ : বটতলার বইয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাব। দ্বিতীয় কারণ : আমাদের ইংরেজি শিক্ষালব্ধ ভিক্টোরীয় মূল্যবোধের প্রভাবসহ, ব্রাক্ষ গোঁড়ামি।'^{১০৪}

উনিশ শতকের ছয়ের দশক পর্যন্ত রেভারেন্ড জেমস লঙই বটতলার বই সম্পর্কে খতিয়ান দিয়েছিলেন। তিনি এ বিষয়ে যে গ্রন্থতালিকাণ্ডলি তৈরি করেছিলেন সেগুলি এই বিষয়ে জানার প্রধানতম অবলম্বন হিসেবে গণ্য হয়। প্রায় ১৪০০ বই এই তালিকাভুক্ত হয়েছিল। যদিও তিনি নিজেই উল্লেখ করেছিলেন এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। বেশ কিছু বই তিনি বাদও দিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও লঙের এই তালিকার সাহায্য ছাড়া বটতলাকে জানা সম্ভবই নয়। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে লঙ যে বইয়ের তালিকা তৈরি করেছিলেন সেটি থেকে বাংলা বইয়ের বিষয়-বৈচিত্র্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর তালিকায় প্রথমে আছে শিক্ষামূলক গ্রন্থ বা পাঠ্যপুস্তক। তারপর পঞ্জিকা, সংবাদ ও সাময়িকপত্র, সাহিত্য, পাঁচালি, সংগীত, আদিরসাত্মক কাহিনি, তারপরে আছে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের কথা, তারপর মুসলমানি বা ইসলামি বাংলা সাহিত্য, একেবারে শেষে আছে পৌরাণিক, শৈব, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক ধর্মগ্রন্থের কথা। আসলে উনিশ শতকের বটতলা ছিল যাবতীয় বই প্রকাশনা এবং বিক্রির এক বড় কেন্দ্রন্থল। অথচ তৎকালীন মেধাজীবীরা যখন নিন্দা করছেন তখন বেছে নিচ্ছেন কেবল সন্তা চটকদার বইগুলিকেই। কিন্তু এই চটকদার বইগুলির যে একটা নিজস্ব স্বাদ ছিল সেকথা অস্বীকার করা যায় না। রসরাজ অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) এই প্রসঙ্গে চমৎকার বলছেন:

'রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ভারতচন্দ্র, মনসার ভাসান, মৎস্যপুরাণ এই রকম আরও কত পুরাণ, বৈষ্ণবগ্রন্থ, বাঙ্গালা আইনের বই এ সব ত বটতলায় ছাপা হতই, তার পর আমি যে সময়ের কথা বলতে আরম্ভ করেছি, সেই সময় একটা নৃতন 'বটতলা সাহিত্য' দেখা দেয়। যদি এক পয়সা দিয়ে এক সরা সখের জলপান কিনে 'ছি ছি, এ ঠাকুরদের দেওয়া চলবে না' কি 'পিঠের মতন পোষ্টাই নয়' বা 'পেস্তার মত সুস্বাদু নয়' বলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করেন, তবে সে বটতলা সাহিত্য সত্য সত্যই আস্তাকুঁড়ে ফেলবার উপযুক্ত। কিন্তু সেই যে গদ্য পদ্যে মিশ্রিত বা শুধু পদ্যে 'কি মজার শনিবার' 'কি মজার রবিবার' 'কি দুঃখের সোমবার' 'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' 'অসৈরণ সইতে নারি' প্রভৃতি চটি বই যা ১ পয়সা বা ২ পয়সা করে বিক্রী হত, তার একখানি পাবার জন্য আমি আজ ৩০ বছর ধরে হয়রান হয়েছি…।' ১০৫

এসব 'সখের জলপান', 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' বা 'ঘোমটার নিচে খ্যামটা নাচ' জাতীয় রচনার কথায় পণ্ডিত মহলের হয়তো নাসিকা কুঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু বটতলার বইয়ের সম্পর্কে এবং তার সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কে অমৃতলাল বসুর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ। তিনি আরও বলছেন:

'আমার কতকটা জানা আছে যে, তখনকার অনেক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকও নাম গোপন রেখে সখ করে ঐ রকম এক একখান বই বটতলার পাবলিসারদের লিখে দিতেন। তবে...অক্ষম অনুকরণকারীরা জিরেন কাটের খেজুর রসে ধুতূরার বীচি মিশিয়ে তাড়ি করে ফেলে, সেইরূপ গ্রাম্য রসিকতার ভিতর কুৎসিত উলঙ্গ অঞ্লীলতার অবতারণা করে একটা বেশ মুখরোচক জিনিষ একেবারে নষ্ট করে দিলে।'১০৬

যার ফলে বটতলার বই মাত্রাজ্ঞানের অভাবে তার মিঠেকড়া স্বাদ ভুলে অশ্লীলতার একঘেয়েমিতে ডুবে যেতে লাগল। তবে সবসময় বইয়ের নাম বা মলাট দেখে তাকে অশ্লীল ভেবে নেওয়াটাও সঙ্গত নয়, কারণ অনেকসময়েই নাম-মাহাত্ম্যে পাঠককে কাবু করা হলেও বিষয়ে সেই ঝাঁঝ থাকত না। তাই সুভদ্রকুমার সেন জানাচ্ছেন:

'বটতলার বিরুদ্ধে আনীত অশ্লীলতার অভিযোগের বিরুদ্ধে আর একটি কথা বলা উচিত। বটতলা প্রকাশিত প্রহসন জাতীয় বইগুলির লেখক এবং প্রকাশকেরা তদীয় ক্ষীণকায় গ্রন্থগুলির, ইংরেজিতে যাকে catchy বলে সে ধরনের নামকরণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।...মজা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রেই নামের তুলনায় প্রহসনের বিষয়বস্তু হত নিতান্তই সাদামাটা, নির্দোষ। অনুমান করতে পারি নামের মোহিনীমায়ায় লুব্ধ রতিরসপিপাসু পাঠকবর্গ হয়তো হতাশই হতেন।'১০৭

বটতলার বইকে একঘরে করার ক্ষেত্রে উচ্চবর্গের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। তাদের নিঃস্পৃহতা আর অবজ্ঞা তো ছিলই, তারই সঙ্গে ছিল ক্ষমতার রাজনীতির সমীকরণ। অদ্রীশ বিশ্বাস জানাচ্ছেন :

'বটতলার সামাজিকতা ভুলে, বিশাল সংখ্যক জনসাধারণের রুচিকে অগ্রাহ্য করে, জনমনস্তত্ত্বকে নস্যাৎ করে, ভাবনা প্রকাশের সুযোগকে অগ্রাহ্য করে, দেশীয় ডিসকোর্সের সবচেয়ে বড় স্পেস-সেই দৃষ্টিকোণকে অগ্রাহ্য করে, উচ্চ-অপর অবস্থানের সামাজিক ও নন্দনতাত্ত্বিক দ্বন্দের নথিপত্র-সেই তথ্য ভুলে, শুধুমাত্র 'জঘন্য' শব্দে উচ্চবর্গীয় অবস্থান নিয়ে নস্যাৎ করে দেওয়াটা বহুকালের বটতলা সম্পর্কিত রাজনীতি।'^{১০৮}

জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে সাহিত্যিক মানচিত্রে ফাটল বাড়িয়ে তুলেছেন আলোকপ্রাপ্ত সম্প্রদায়। একটি উদাহরণের সাহায্যে দেশজ মনোরঞ্জক বটতলার সাহিত্যের প্রতি উচ্চবর্গীয়ের মনোভাবটি বুঝিয়ে দেওয়া যাক। এখানে উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ও চিন্তাবিদের শাণিত কলমের আঘাতে বিদ্ধ হয়েছে জনপ্রিয় আখ্যান সরবরাহকারী বটতলা, হয়েছে ব্যঙ্গের লক্ষ্য:

'হে বটতলা বিদ্যাপ্রদীপ-তৈল প্রদায়িনি। আমার বুদ্ধির প্রদীপ একবার উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যাও। মা! তোমার দুই রূপ; যে রূপে তুমি কালিদাসকে বরপ্রদা হইয়াছিলে, যে প্রকৃতির প্রভাবে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদৃত, শকুন্তলা জন্মিয়াছিল...সে রূপে আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পীড়া জন্মাইওনা,...যে প্রকৃতি প্রসাদে ভারতচন্দ্র বিদ্যার অপূর্ব্ব রূপ বর্ণন করিয়া বঙ্গদেশের মনোহরণ করিয়াছিলেন, যাহার প্রসাদে দাশরথি রায়ের জন্ম, যে মূর্তিতে আজও বটতলা আলো করিতেছ, সেই মূর্তিতে একবার আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হও, আমি আশমানির রূপবর্ণন করি।'১০৯

উনিশ শতকের অন্যতম চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রের কলম এভাবেই প্রকাশ করেছে দেশজ মৃত্তিকালগ্ন সাহিত্য-কারবারি বটতলার প্রতি শিক্ষিতের মানসিকতাকে। শুধু এখানেই নয়, 'কমলাকান্তের দপ্তর'এও এর সূত্র মেলে। বহুদর্শী কমলাকান্তের নেশাগ্রস্ত দিব্যদৃষ্টিতে উনিশ শতকের জনপ্রিয় বাংলা বইয়ের বাজার নিম্নমানের সামগ্রীতে ঠাসা, যার উপকরণ বালক এবং নারীসমাজের মনোরঞ্জক তুচ্ছ পদার্থ। তিনি আফিমের মাত্রা চড়িয়ে দিব্যদৃষ্টিতে সাহিত্যের বাজার দেখতে পেয়েছিলেন :

'দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন, বুঝিলাম ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম, আর কতকগুলি মনুষ্য নীচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন---বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম-অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয় বিক্রয় করিতেছে...জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কিসের দোকান?" বালকেরা বলিল, "বাঙ্গালা সাহিত্য।"...বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম---খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ষ কদলী।

এর মূলে কাজ করেছে বঙ্কিমের তথাকথিত নাগরিক উন্নাসিকতা। রামগতি ন্যায়রত্নের (১৮৩১-১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ) 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-এও বটতলা সম্পর্কে সমালোচনা করে বলা হয়েছে : 'পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালা গ্রন্থের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সেই সকলগুলিই যদি গ্রন্থের মতো গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে এই অবস্থাকে ভাষার যার পর নাই সৌভাগ্যের অবস্থা মনে করা যাইতে পারিত।…তন্মধ্যে এমত সকল গ্রন্থ আছে, যাহা একেবারে পৃতিগন্ধী গলদ্গোময়। পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা সে সকলেও হস্তক্ষেপ করিব।'

কিন্তু উচ্চবর্গের যতই নাসিকা কুঞ্চনের মনোভাব থাকুক না কেন, একথা না মানলে অন্যায় হবে যে বটতলার কারণেই বাংলা বই একটা বড় পরিসরে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল। অমৃতলাল বসু তাই জানাচ্ছেন :

'বটতলার সরস্বতীকে আহ্বান করে একটু বিদ্রূপ করার পর থেকে অনেক সাহিত্য-ঘোড়সওয়ার বটতলার নামে নাক সিঁটকে থাকেন। বলি, ও ঠাকুর! কোথায় থাকত তোমার বাঙ্গালা বিদ্যা, বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা ধর্ম, বাঙ্গালা পুণ্য, বাঙ্গালা গদ্য-পদ্য যদি না চোদ্দ আনায় বিকুত বটতলার বাঙ্গালা মহাভারত, বাঙ্গালা রামায়ণ!'^{১১২}

ভুল বানানে বিসদৃশ ছাপায় বটতলার ছাপাকে কেন্দ্র করে একটা বিদ্রূপ বাজারে প্রচলিত ছিল। সেটি হল 'শবল কাবল ভূষি ভূষি সে কাবল'। এর অর্থ হল গলিতনখদন্ত কাঠের যন্ত্রে, ভাঙা অক্ষরে ছাপা বটতলার বইতে নাকি 'সকল কারণ তুমি, তুমি সে কারণ' এর মত বাক্য ওরকম 'শবল কাবল…'এর চেহারা নিত। এই নিয়ে উচ্চবর্গের তামাশার অন্ত ছিল না। তবে তাতে লোক-সাধারণের সাহিত্যপাঠ আটকায়নি। গবেষক বিনয় ঘোষ বলেছেন:

'এই 'ভূষি ভূষি' ছাপা পড়েই একসময় আমাদের দেশের সাধারণ লোক সাহিত্য-সম্পদের আস্বাদ কি তা বুঝতে পেরেছেন এবং ছেনিকাটা হরফে ভুল ছাপা কৃত্তিবাস-কাশীরাম-মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের কাব্য, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, প্রহ্লাদচরিত, কৃষ্ণমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল ইত্যাদি পাঠ করে তাঁদের মনটা সরস ও সংস্কৃত হয়েছে।'^{১১৩}

বটতলার লেখাগুলির মধ্যে শুধুমাত্র সস্তা লোকরঞ্জনের উপাদান ছিল না, তার মধ্যে একটা স্পষ্ট বাবু-বিরোধী কালচারও ছিল। আদিরস, কথ্যভাষা, হালকা চাল, সুলভ মূল্য, মনোরঞ্জনের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ---সব মিলে তৈরি হয়েছিল সাধারণ মানুষের লোকপ্রিয় সাহিত্য, যা ছিল ভদ্রসমাজের সাহিত্য ও শিল্পকলার বিরুদ্ধে এক প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ। অদ্রীশ বিশ্বাস তাঁর রচনায় অনুভব করতে চেয়েছেন সেই সময়ের স্পন্দন :

'সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ---একদিকে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার নানা চাপ ও ভয়, যাতে মূক হয়ে আছে সরকারি চাকরিপ্রাপ্ত বাঙালি সমাজ আর অন্যদিকে 'বাবু', 'ভদ্রলোক'দের সঙ্গে সাধারণ মানুষের শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতি-ধর্ম ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে উত্তরোত্তর বেড়ে যাওয়া ফাঁক---একটা অসম চাপা ক্ষোভ বাঙালি সমাজে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। সাধারণ মানুষেরা এই ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেদের কথা-ক্ষোভ-হতাশা বলতে না পারার সমস্যায় তাঁদের মতো করে পথ বের করে নেন। লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যে এর একটা প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।'

তিনি আরও বলেছেন তাদের বক্তব্যের অভিমুখ প্রায়ই থাকে ক্ষমতাবানের আচরণের ক্রিটির প্রসঙ্গ তুলে ধরার দিকে :

'শাসক ইংরেজ, আইন-আদালত, উকিল-মুহুরি, বাবু, শিক্ষক, শাস্ত্রজ্ঞ, চার্চ, হিন্দুত্ববাদী পুরোহিত-এই ধরনের 'ক্ষমতাবান' যা কিছু তাকে সমালোচনা, নস্যাৎ করার মধ্যে 'অপর' অবস্থানের জয়ের আনন্দ হয়। এভাবেই এক ধরনের লড়াই চলতে থাকে।...এদের নানা স্ববিরোধিতা, অসাড়ত্ব, চাপিয়ে দেওয়ার কুফলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় 'অপর' অংশের বটতলা।'

বটতলার এই সরব কণ্ঠের প্রসঙ্গে শ্রীপান্থ বলেছেন:

'একদিকে ইংরেজি শিক্ষিত নব্য বাঙালি, সমাজ সংস্কারক এবং ধর্ম আন্দোলনকারীরা, অন্যদিকে কারিগর, শিল্পী এবং নগরে তখনও উদ্বাস্ত প্রায় গ্রামবাংলার ভাগ্যাম্বেষী মানুষের দল। শহরের আলো হাতছানি দিয়ে তাদের কাছে টেনে এনেছে, কিন্তু আপন করতে পারেনি। নগরের হালচাল দেখে তারা বিভ্রান্ত, বিচলিত, হতাশ এবং বিমর্ষ। কেননা, পুরনো মূল্যবোধ এখানে বিপর্যন্ত, অথচ যা কিছু নতুন তার মধ্যে বৈপরীত্য, শঠতা এবং কপটতাও তো কম নয়। এই জটিল কুটিল সামাজিক নক্শায় বাঙালি সমাজ এবং সংস্কৃতিতে দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত যখন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তারই মধ্যে বিশ্বম্ভর দেব নামে একজন

ছাপাখানা খুলে বসলেন বাঙালি সংস্কৃতির রাজধানীস্বরূপ বটতলায়। অবরুদ্ধ আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, কামনা-বাসনা, আশা-নিরাশা, ক্ষোভ এবং বিক্ষোভের উৎসমুখ খুলে গেল। সহসা মুখর হয়ে উঠলেন মূকের দল।

এভাবেই বটতলা পেল তার বিকাশের পথ। বটতলা কুলীন পদবাচ্য না হলেও উপেক্ষার বস্তু নয়। অমৃতলাল বসু বটতলা সম্পর্কে এই মৃল্যায়ন করেছেন যে :

> 'সে বায়রন নয়, ব্রাউনিং নয়, শেলি নয়, সুইফট নয়, হেম নবীন রবীন্দ্র সত্যেন্দ্র নয়, কিন্তু সেই সব বইয়ের একটা ভাষা ভাব ছন্দ রস ছিল যা তার নিজস্ব; পেস্তার মিষ্টতা সথের জলপানে নাই বটে, কিন্তু বর্ষার বৈকালে বাদাম পেস্তাও গরম গরম সথের জলপানের মত মুখরোচক হয় না।'^{১১৭}

সুতরাং বটতলার একটা নিজস্ব পরিসর ছিল, নিজস্ব স্থাদ ছিল। আর নিজেদের ক্ষমতা আর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বটতলার লেখকদের ধারণাও ছিল। সুভদ্রকুমার সেন জানাচ্ছেন:

'বটতলার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতনামা লেখকেরা নিজেদের এবং সমসাময়িক জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পরিচয় লেখকদের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্পর্কে যে অতি মাত্রায় সচেতন ছিলেন তার ভালো দৃষ্টান্ত পাই অজ্ঞাতনামার 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু'তে (১২৭৮ বঙ্গান্দ)। প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করি। বঙ্কিমের মতো নাই কলমের জোর। নভেল হলো না লেখা এরাতি ত ভোর।। অই দেখ দীনবন্ধু। তোমায় দেখিয়া। নাটক লিখিতে যান কত শত মিয়া।। লেখনি সিঁধেল কাটি ডান হাতে ধরি বই না বাহির হতে হয় ধরাধরি।।'

সমকালের ইংরেজি শিক্ষার মানদণ্ডের দিক থেকে বিচার করলে বটতলার সমস্ত লেখক যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন না। কখনো কখনো তাঁদের রচনাও হত চড়াদাগের, স্থূলরুচির। কিন্তু সকলকেই এক মাপকাঠিতে বিচার করলে অবশ্যই অন্যায় হবে। কারণ বেশ কিছু বটতলার বইতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ছায়া লক্ষিত হয়েছে, এমনকি পাশ্চাত্য নভেলের উদ্ধৃতি পর্যন্ত মিলেছে। যা থেকে বোঝা যায় সেই লেখক পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে 'উদাসী কন্যার গুপ্তকথা' রচনাটির কথা। এখানে স্তবকের শীর্ষে যেমন স্কটের উদ্ধৃতি পাওয়া গেছে, তেমনই

মাইকেলের উদ্ধৃতিও পাওয়া গেছে। রকমারি গদ্য পদ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে বটতলার সাহিত্যসম্ভারে। যেমন পণ্ডিত সুকুমার সেন (১৯০০-১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ) জানাচ্ছেন :

> 'গদ্যে গল্প লেখবার নতুন পথের সন্ধান করতেও বটতলা কসুর করেনি। 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'দুর্গেশনন্দিনী' বেরোবার আগে বটতলা থেকে 'হেমলতা-রতিকান্ত' (১৮৪৭) বেরিয়েছিল। বটতলার 'কামিনীকুমার' (১৮৫৬) অনেক প্রকাশক কর্তৃক অনেকবার ছাপা হয়েছিল। এ কাহিনীর প্রভাব দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে পড়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরানী' উপন্যাসেও পড়েছে।'^{১১৯}

বটতলা হয়তো নব্যশিক্ষিত বাঙালির কাছে তেমন আমল পায়নি, কিন্তু জনতার পাঠ-তৃষ্ণা মেটাবার অন্যতম এই মাধ্যমকে উপেক্ষা করলে ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়। শ্রীপান্থ বলছেন :

> 'বটতলার লেখকরা হয়তো উনিশ শতকের নব্য বাঙালির মানসলোকের নির্মাতা নয়, কিন্তু তাঁদের হাতেই কার্যত মুদ্রিত হরফ-নির্ভর বাণী এবং বিদ্যায় সর্বজনের দীক্ষা। যদি ধরেও নিই কলকাতা সেদিন 'গ্রন্থে গ্রন্থে অন্ধকার', তাহলেও কিন্তু মানতে হয় ওই অন্ধকার ছিল বলেই আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল নব্য সাহিত্যের মিশ্ধ, রঙিন, মায়াবী প্রদীপগুলো।''

এই রঙিন মায়াবী প্রদীপের আলোয় তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্র-শ্রেণির সাহিত্যপথ যতই আলোকিত হোক না কেন, জনরুচির মনের আঁধার কাটাতে বটতলার রেড়ির তেলের আলোই ছিল ভরসা। এই প্রসঙ্গে আশিস খাস্তগীর বলছেন :

'উনিশ শতকীয় বাংলা কালচারের দুটি পিঠ। একদিকে এলিট ক্লাস তথা ভদ্রলোকীয় কালচার, অন্যদিকে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালানো বটতলা কালচার। ইতিহাস বলছে উনিশ শতকের বাংলা বইয়ের বেড়ে ওঠার অন্যতম আঁতুড়ঘর এবং কারিগর এই বটতলা। সেকালে জনরুচির বড়ো অংশের ধারক বটতলা। আজকের দিনে 'পাবলিক টেস্ট' বা জনরুচি বলতে যা বুঝি, সেকালে বটতলাই তার নাড়ির গতি সর্বপ্রথম সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিল।'^{১২১}

আর এই জনরুচির পোষক হিসেবেই তার সুনাম বা দুর্নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। সুনাম সাধারণের মধ্যে, আর দুর্নাম তথাকথিত নীতিবাগীশদের মধ্যে। গবেষক বিনয় ঘোষ জানাচ্ছেন:

শিল্পী ও সাহিত্যিক মাত্রেই লোকসমাজে বাহবা কামনা করেন।
যশ বৈরাগ্যের বড়াই করাটাইও আত্মপ্রচারের একটা কৌশল
মাত্র। দেশে দেশে, কালে কালে, সাধারণের রুচি
বদলায়।...যুগে যুগে শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সেই লোকরুচি
পরিতৃপ্ত করে থাকেন, কারণ তা না হলে লোকপ্রিয় হওয়া যায়
না। তা যাঁরা করেন না তাঁরা আর্নল্ড বেনেটের ভাষায় হয়
দেবতা, না হয় নীরেট বোকা। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পী কমবেশি তাই করে এসেছেন।...'পাবলিক' বলে যে পদার্থকে কেউ
কেউ অবজ্ঞা করে থাকেন, তা অবজ্ঞার বস্তু নয়।...পৃথিবীর
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা যদি যুগধর্মের সেবা করে থাকেন,
পরিবর্তনশীল লোকরুচির খোরাক যুগিয়ে লোকপ্রিয় হয়ে
থাকেন, তাহলে বটতলার সাহিত্যিকরা তাঁদের কালে তাই করে
এমন কিছু গর্হিত কাজ করেছেন বলে মনে হয় না।'

> বি

বটতলার রোমাঞ্চকর নানা কাহিনির ক্রেতাদের একটা বড় অংশ ছিল দিন-আনা-দিন-খাওয়া মানুষ। চারিদিকের নানা চাপে তারা ছিল বিধ্বস্ত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সারাদিনের রুটি-রুজির বন্দোবস্ত করার পর তারা চাইত একটু উত্তেজনার আঁচে নিজেদের ক্লান্ত স্নায়ুতন্ত্রকে সেঁকে নিতে। দৈহিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ছিল সোনাগাছিতে বারবনিতাদের গৃহ। আর মানসিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ছিল বটতলার সচিত্র কেচ্ছাকাহিনি। সমালোচক অনিন্দিতা ঘোষ উল্লেখ করেছেন:

'শহরের গণিকাপল্লী, থিয়েটার, খেমটা নাচ, সঙ যাত্রা ও গাঁজার আড্ডা ইত্যাদি কিছুটা মনোরঞ্জন করত ভাগ্যবিড়ম্বিত দারিদ্রজীর্ণ কেরানিকুলের। কিন্তু হাতের কাছে সহজে বহনযোগ্য বটতলার বইয়ের উত্তেজক বিনোদন হিসেবে কোনো বিকল্প ছিল না।'^{১২৩}

প্রখ্যাত তাত্ত্বিক গৌতম ভদ্র (১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ) বটতলার সাহিত্য সম্পর্কে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করেছেন এভাবে :

'তাহলে বটতলার সাহিত্যটা কী? বটতলার সাহিত্যটা অনেক কিছু, নানা রঙের এক বর্ণালী। এই সমাবেশে আমরা আড়াআড়ি ও খাড়াখাড়িভাবে বিন্যস্ত নানা প্রতিচ্ছেদ লক্ষ করি, প্রতিচ্ছেদের বিন্যাসের রকমফের অনুযায়ী বিভাজনের রেখাগুলি নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিষ্ঠানের চাপ, ব্যক্তির অভিরুচি, বাজারের চাহিদা, গোত্রের নিশানা---সব মিলে যেন বটতলার

প্রকাশন জগৎ নানা রঙে ছোপানো এক কোলাজের অবয়ব নেয়।²²⁸

বটতলার বইয়ের যে নিজস্বতা, তার সঙ্গে জনপ্রিয়তার শর্ত ভীষণভাবে জড়িত। জনপ্রিয়তার দাবীকে স্বীকৃতি দিয়েই এই বইয়ের একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে উঠেছিল। তার ভাণ্ডারে ছিল 'বিবিধ রতন'। তাই শ্রীপান্থ বলছেন :

'সত্যি বলতে কী, বিষয় বৈচিত্র্যে বটতলার কোনও তুলনা নেই। ধর্ম, পুরাণ, মহাকাব্য, কাব্য সংগীত, নাটক, কাহিনি, যাত্রার বই (পরে থিয়েটারেরও), পঞ্জিকা, সাময়িকপত্র, শিশুপাঠ্য, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ, অভিধান, ভাষাশিক্ষা, কারিগরিবিদ্যা--- এমন কোনও বিষয় নেই যা ছিল বটতলার কাছে অজানা। সংস্কৃত, ফরাসি, উর্দু, ইংরেজি---নানা উৎস থেকে কাহিনি সংগ্রহ করেছেন বটতলার লেখক ও প্রকাশকরা।...বটতলা সেদিক থেকে সাধারণ বাঙালির কাছে যেন এক খোলামেলা বিশ্ববিদ্যালয়, আজকের ভাষায় যাকে বলে 'ওপেন ইউনিভার্সিটি।'...' স্বিক

এই বটতলার অন্যতম কৃতিত্ব হল সমাজের মুখোশ খুলে তার সত্য রূপটা উদ্ঘাটন করা। এটা হয়তো সকলের ভালো লাগেনি, কিন্তু বটতলা তার পথ থেকে সরেও আসেনি। অদ্রীশ বিশ্বাস বলেছেন :

'বটতলাকে সামাজিক অধঃপতনের টেক্সট হিসাবে উচ্চবর্গের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে বারবার, কিন্তু বটতলাই হল সেই সত্য-দর্পণ যেখানে সমাজের মুখোশ-পরা মিথ্যা ছবিটা নয়, মুখোশহীন আসল রূপটা ধরা পড়েছে। সেটা প্রধান ধারার লেখক-পাঠক-বুদ্ধিজীবীদের ভাল লাগেনি। বটতলা তা মান্য করেনি। সে তার পথে চলেছে।'^{১২৬}

এমনকি তার অশ্লীলতা দোষ নিয়ে যে উচ্চবর্গের শুচিবায়ুগ্রস্তরা মুখর, বটতলার তা অজানা ছিল না। আর সে প্রসঙ্গেও সে সরব। যেমন 'কৌতুক শতক' এর মুখবন্ধে আছে:

'রসিকের রসাভাষ যারা নাহি বোঝে, তারাই কেবল মোর দোষগুলি খোঁজে! কোথায় করেছি আমি প্রমদার সনে প্রেমালাপ কৌতুকীর হৃদয়রঞ্জনে; অরসিকে না পেয়ে সে রসের আস্বাদ,

অশ্লীল বলেছি বলে দেয় অপবাদ।
শিশুগণে নীতিশিক্ষা দেবার কারণ,
করি নাই আমি কিছু জনম গ্রহণ,
করিতে প্রাচীনচিত্তে বিবেকসঞ্চার,
হয় নাই হয় নাই জনম আমার।

বটতলার প্রতি মূলত যেসব অভিযোগ করা হয়, তার প্রতিটি সম্পর্কেই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর করেছে বটতলার বই-ই। সে জন্য সে লজ্জিত নয়। নিজের অবস্থান সম্পর্কে সে সচেতন। রসের কথা না বলে মানবচিত্তে কেবল সুরুচি এবং সুনীতির বীজ বপন করার অভিপ্রায় যে তার নেই একথা স্বীকারে বটতলা দ্বিধাহীন।

বটতলার বই : সময়ের ঢেউ

বটতলার বই বিষয়বস্তু হিসেবে চিরায়তকে যেমন পছন্দ করেছে, তেমনই সাময়িকতাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে দেখা যাচ্ছে। কারণ এগুলি তাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, পৌরাণিক কাহিনি থেকে ব্রতকথা যেমন ছেপেছে, তেমনই নানা কিসিমের রচনায় সমকালকে ধরে রেখেছে। নকশায়, প্রহসনে, গুপ্তকথায় সমকালের সামাজিক বিতর্ক, কেচ্ছা, নানা প্রথা, যৌন কেলেঙ্কারি কিছুই বাদ যায়নি। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন:

'বটতলা-প্রকাশিত প্রহসন, কাব্যগ্রন্থ, চুটকি, এই-জাতীয় রচনা, সমকালীন জনমানসের দর্পণ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। কারণ এইসব লেখাতে দেখতে পাওয়া যায়, সেই সময়কার নিত্যনতুন ঘটনার প্রতিক্রিয়া রূপে, রাস্তায়-ঘাটে, হাটে-বাজারে সাধারণ মানুষের চিন্তাভাবনা তাদের নিজস্ব বাগ্ভঙ্গিতে বের হয়ে আসছে। মহানগরী কলকাতা তখন নানা ধরনের ঘটনার কেন্দ্রস্থল-উত্তেজনাপূর্ণ কোনো খুনের ঘটনা থেকে গঙ্গাবক্ষে সেতুনির্মাণ, রোমাঞ্চকর কোনো চুরির ব্যাপার থেকে রেলগাড়ির প্রচলন।'^{১২৮}

দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে বটতলার লেখকেরা এই জাতীয় নানা রচনা প্রকাশ করেছিল। যেমন সোনাগাজিতে খুন, বাগবাজারে মদনমোহন মন্দিরের ছাদ ভাঙা, কলকাতার কালীমন্দিরের প্রতিমার গয়না চুরি, মাছের বসন্ত রোগ বা মাছে পোকা হওয়া, বাষ্পচালিত রেলগাড়ির আবির্ভাব ইত্যাদি বিষয়ে লেখা প্রহসন ইত্যাদির নমুনা পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

কলের গাড়ি: গাড়ির কল

মুঙ্গী আজিমদ্দীন লিখেছিলেন 'কি মজার কলের গাড়ি'। রেলগাড়ি প্রসঙ্গে বিস্ময় আর মুগ্ধতার রেশ তাতে ধরা পড়েছে। সেখানে কলের গাড়ির অপূর্ব আবিষ্কর্তার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে:

'বানিয়েছে রেল রোডের গাড়ি ধন্য সাহেব কারিগর এখন বিশ্বকর্ম্মার পূজা ছেড়ে ঐ সাহেবকে পূজা কর।'^{১২৯}

এই রেলগাড়ির প্রচলনের ফলে চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় শহর থেকে সপ্তাহান্তে দ্রুত ঘরে ফিরতে পারতেন। তাঁদের পরিবারবর্গ তাঁদের প্রতীক্ষায় বসে থাকতেন। আবার লেখক দেখিয়েছেন এর ফলে যে সমস্ত অসতী নারী উপপতি বিলাসিনী ছিল তাদের সাক্ষাৎ নির্ধারিত হত ঐ কলের গাড়ির সঙ্গে সময় বেঁধে। গাড়ি আসার সময় হলেই ধনি উপপতিকে বিদায় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত:

'যাও যাও হে প্রাণনাথ ঐ এলো এলো গাড়ি কি জানি সে সর্ব্বনেশে পড়ে যদি এসে বাড়ী।'^{১৩০}

কোনো সন্দেহ নেই যে এই আগুনের রথের অসীম শক্তি সাধারণ মানুষের মনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। শুধু সংবাদ বা সাময়িকপত্রে নয়, বটতলার নিজস্ব পরিমণ্ডলেও এর ফলে যথেষ্ট আলোড়ন উঠেছিল। এও সাময়িকতার দলিল হিসেবেই স্বীকৃতি পাবে।

নেশায় মত্ত প্রজন্ম : সভ্যতার জয় নাকি আত্মক্ষয়?

নেশা সম্পর্কেও বটতলা থেকে প্রচুর লেখালিখি হয়েছিল। সে সময়ে নেশার কবলে পড়ে একটা প্রজন্ম রীতিমতো উচ্ছন্নে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বিভিন্ন আমোদেপ্রমোদে মদের ফোয়ারা ছুটত। সমাজের ওপরতলাতেও এর ভালোই রেওয়াজ ছিল। বিশেষত মদ্যপান সভ্যতার অঙ্গ হিসেবেই পরিগণিত হত। প্রাচীন সংস্কারের শিকল কেটে ব্যক্তিস্বাধীনতার উল্লাসে গা ভাসাতে অনেকেই প্রথমে বেছে নিতেন মদ্যপানকে। এমনকি তথাকথিত শিক্ষিত বাবুরাও মনে করতেন মদ্যপানই সভ্যতার অন্যতম চিহ্ন। 'আত্মচরিত'এ রাজনারায়ণ বস (১৮২৬-১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ) লিখেছেন:

'তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই।'^{১৩১}

শুধু তাই নয়, মদ্যপায়ীরা নিজেদের পক্ষে যুক্তি সাজাতেও ছিল ওস্তাদ। 'কলিকাতার নুকোচুরি' তে বলা হয়েছে :

'মদে যে কি মজা হয়, তা যারা খায়, তারাই জানে। মন প্রফুল্ল করে, Mind enlarge করে, Ideas নতুন নতুন হয়, ভাব নানা প্রকার আসে, ও ভক্তির উদয় হয়।'^{১৩২}

'আপনার মুখ আপুনি দেখ' তে বলা হয়েছে :

'যখন যে দেশ যে জাতীয় রাজার অধিকারে ভুক্ত হয়, সেই ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন হইয়া থাকে। রাজপুরুষদিগের সুরা অত্যন্ত আদরণীয়া, অতএব রাজ প্রথানুসারে আমরা সুরাপান করিতে পারি।'^{১৩৩}

কাজেই বহু প্রতিভার এবং সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটেছিল মদের বোতলে তলিয়ে গিয়ে। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'সে কাল আর এ কাল' রচনায় বলেছেন :

'ব্রাণ্ডিরূপ অগ্নিময় পানীয় দ্বারা এ দেশের কত অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতেছেন।...এই অগ্নিতে কত ধনী, মানী ও বিদ্বানের প্রাণ আহুতিস্বরূপ নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার ইয়ন্তা করা যায় না।''^{১৩৪}

'কলিকাতার নুকোচুরি'তে এক বেশ্যা এক মাতালকে যখন বলেছে মদ খেলে নরকে যেতে হবে, তখন মাতাল প্রশ্ন করেছে :

'বাবা, মদ খেলেই যদি নরকে যায়, তবেত নরক আজকাল ভারি গুলজার, কলিকাতার বড়২ বাবুরা যাঁরা মদ খেতেন তাঁরা তবে কোথা গ্যাচেন? অবিদ্যা তখন বলেছে "যিনি২ ও কাজ কোরেছেন সকলেই নরকে গ্যাচেন।" তখন মাতালের বক্তব্য "তবে সেখানে গেলেমই বা, তাতে দোষ কি? আমি একাকি স্বর্গে গিয়ে কি কোরবো"?'^{১৩৫}

রসিকতার ছলে ব্যক্ত হলেও নেশাখোরের অভিপ্রায় বুঝতে দেরি হয় না এখানে। মদ্যপানের কুফল তাই ক্রমশই মানুষকে চিন্তিত করে তুলতে লাগল। টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ) এই বিষয়ে লিখেছিলেন 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়'। সেই রচনার শুরুতেই তিনি আক্ষেপ করেছেন:

'কলিকাতায় যেখানে যেখানে যাওয়া যায় সেইখানেই মদ খাইবার ঘটা। কি দুঃখী, কি বড় মানুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে।'^{১৩৬}

কেশবচন্দ্র সেন 'মদ না গরল', 'সুলভ সমাচার' ইত্যাদিতে মদ্যপানের কুফল নিয়ে প্রচার শুরু করেন। মানুষকে মদের সর্বনাশা নেশা থেকে মুক্ত করতে শুরু করেন 'Band of Hope'। এর পাশাপাশি বটতলা থেকেও নানা বইপত্র প্রকাশিত হচ্ছিল, যেখানে নেশার কুফল তুলে ধরার সম্যক প্রয়াস দেখা যায়। যেমন মহেশচন্দ্র দাস দে লিখেছিলেন 'নেশাখুরি কি ঝক্মারি', প্রিয়শঙ্কর ঘোষ লিখেছিলেন 'সুরাপান কি ভয়ঙ্কর!!!', 'সুরাপান বিষয়ক প্রস্তাব' ইত্যাদি। 'নেশাখুরি কি ঝক্মারি' তে তো স্পষ্টই বলা হয়েছে 'নেশা মাত্রই ভাল নয়'। কেবল মদ্যপানই যে মন্দ তা নয়, সকল নেশাই মন্দ। সেখানে সাবধান করা হয়েছে 'গাঁজা যদি খায় তাহলে লক্ষ্মী ছাড়ে, গুলি খেলে হাড় কালি হয়, চণ্ডু পান করলে তার গৃহে ঘুঘু চরে, আফিম পানে মৃত্যু হতে পারে।

রোমাঞ্চকর কেচ্ছাকাহিনি : গুপ্ত নাকি ব্যক্ত!

চিরকালই মানুষের জীবনের প্রিয়তম বিনোদনের মধ্যে অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় পরচর্চা। অন্যের 'হাঁড়ির খবর' নিতে মানুষ কখনোই ক্লান্ত হয় না। আর বিশেষ করে তা যদি হয় নিজের থেকে ধনে, বিত্তে, শিক্ষায় বা সম্মানে এগিয়ে থাকা কারো ব্যক্তিগত পরিসর, তাহলে এই ঔৎসুক্য চরমে ওঠে। তথাকথিত নির্মল নিটোল জীবনের মধ্যে কোনো ছিদ্র খুঁজে পেলে তারিয়ে তারিয়ে তার রসাস্বাদনে মেতে ওঠে আপামর জনতা। তাই নিয়ে চলতে থাকে মুখরোচক আলোচনা। আবার একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রদীপের তলাতেই অন্ধকারের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। তাই এদের অসত্য বলে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে কেচ্ছার প্রতি সমাজের আগ্রহের কথা। উনিশ শতকের সমাজ তার ব্যতিক্রম ছিল না। অদ্রীশ বিশ্বাস বলছেন :

'নানা জাতীয় কেচ্ছা-কাহিনিতে ভরপুর ছিল উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ। এটা পপুলারের একটা লক্ষণ, উচ্চবর্গের কুকীর্তি বিষয়ে আড়ি পাতা, মুখর হওয়া। আমজনতা যেটা পায় না, সেটাকে বিপদগ্রস্ত হতে দেখলে বিপর্যস্ত হতে দেখলে আনন্দ পায়। দেখ কেমন লাগে জাতীয় আনন্দ। সে অপেক্ষা করে, দেখি না কী হয়! উনিশ শতকে যেহেতু প্রচুর সংবাদ ও সাময়িকপত্রের প্রচলন ঘটে, তাদের দৌলতে অনায়াসে উচ্চবর্গের কেচ্ছা জেনে যাওয়াটা সহজ হয়ে যায়। নানা কেচ্ছা সেভাবেই বিখ্যাত হয়েছিল। '১৩৭

বড়ঘরের নানা কেচ্ছা তো ছিলই, তার মধ্যেও সর্বাধিক জনপ্রিয় হয়েছিল মোহন্ত-এলোকেশীর কেচ্ছা। ধর্মগুরু আর কুলবধূর এই ব্যভিচারে তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল চারিদিক। পরস্ত্রী এলোকেশীর সঙ্গে তারকেশ্বরের প্রভাবশালী মোহন্তের অবৈধ সম্পর্ক এর মূলকথা। ধর্মের ধ্বজাধারীর এরকম পাপে কেঁপে উঠেছিল জনগণের মন।

কাজেই এলোকেশীর স্বামী নবীন সব ঘটনা জানার পর স্ত্রীকে হত্যা করলে জনসমর্থন তার দিকেই গিয়েছিল। নবীনের দ্বীপান্তর প্রসঙ্গে তাই রচিত হয়েছিল :

> 'তুমি যাচ্ছ দ্বীপান্তরে, সহে না রে এ অন্তরে, চেয়ে দেখ দুঃখান্তরে যত বঙ্গবাসীগণ।'^{১৩৮}

মোহন্তের এই কেলেঙ্কারি নিয়ে অজস্র কেচ্ছার জন্ম হয়েছিল। প্রচুর নাটক, প্রহসন, নকশা ইত্যাদি রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু হল 'মোহন্তের এই কি কাজ', 'মোহন্তের কি দুর্দশা', 'মোহন্তের দফারফা', 'তারকেশ্বর নাটক' ইত্যাদি। আর এসব রচনায় মোহন্তকে তীব্র বিদ্রাপ করা হয়েছিল। যেমন একটি প্রহসনে বলা হচ্ছে:

'মোহন্ত রাজা রাখ্লে ধ্বজা এই কলিকালে মঠের গদি তেজ্য করে বাসর কোল্লেন হুগলি জেলে।।"^{১৩৯}

কেচ্ছার প্রসঙ্গেই উঠে আসে গুপ্তকথা বিষয়টি। এই গুপ্তকথা বটতলার অন্যতম এক জনপ্রিয় ধারা। আসলে 'গুপ্তকথা শব্দটি উচ্চারণ করলেই আমাদের পরচর্চার অতিপ্রিয় প্রবণতায় লাগে শিরশিরে হাওয়া। আর এই শব্দবন্ধটি যখন বটতলা থেকে প্রকাশিত উপন্যাসের শিরোনাম হয়ে আখ্যাপত্র জুড়ে থাকত, তখন পাঠক মহল তোলপাড় হওয়ারই কথা। গুপ্তকথার ওপর পাঠক সমাজের তীব্র আকর্ষণের ওপর অঢেল আস্থা রেখেই উনিশ শতকের পড়ন্ত বেলায় বাংলা সাহিত্যের বাজার মাতিয়েছিল বটতলার এই পশরা। অবশ্য এলিট পাঠক প্রকাশ্যে নাক কুঁচকেছে 'নিচুতলার সাহিত্য' অভিধা দিয়ে, আর আড়ালে মনোযোগ দিয়ে গিলেছে এই 'গুপ্তকথা' সাহিত্য' মণ্ড গাবিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে এমনটাই জানাচ্ছেন সমালোচক চণ্ডিকাপ্রসাদ ঘোষাল। বনেদী পরিবারের নানা কেচ্ছা, অজাচার, ব্যভিচার, গুপ্তপ্রণয়ের অবিশ্বাস্য ক্লেদাক্ত সব কাহিনি, সামাজিক ভাঙন, তীব্র কামনার টানে ভেঙে পড়া সামাজিক-পারিবারিক সম্পর্কের আগল, অবৈধ-অনৈতিক সম্পর্ক ইত্যাদি ছিল গুপ্তকথার জনপ্রিয়তার অন্যতম রসদ। শ্রীপান্থ বলছেন:

'এ কোন কলকাতা?...কলকাতার এ কোন সমাজ? উনিশ শতকের কলকাতা বাঙালির গর্ব।...কলকাতার আকাশে অনেক উজ্জ্বল নক্ষত্র।...আধুনিকতার হাওয়া।...কলকাতায় যেন আলোর প্লাবন। নতুন কাব্য। নতুন গান। নবযুগের নতুন সাহিত্য। তারই মধ্যে 'এই এক নূতন' বলে শহরের পথে হাঁক দিয়ে ফিরছে যে ফিরিওয়ালা তার হাতে এ কোন কলকাতার খবর? এ কলকাতা চাঁদের উল্টো পিঠ। এ কলকাতায় থমথমে অন্ধকার। এ কলকাতা আকণ্ঠ ডুবে আছে পাঁকে।'১৪১

এসব নিয়েই কলকাতার গুপ্তকথার জগং। বেশ কিছু গুপ্তকথায় বেশ খোলাখুলি সমাজের উঁচুতলার প্রতি বিষোদ্গার করা হয়েছে এবং তার সাপেক্ষে আছে তথাকথিত নিচুতলার প্রশংসা। যেমন কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'সংসার সর্বরী বা ভবসংসারের গুপ্তকথা' তে হরিদাসীর আক্ষেপ :

'যেসব কথা শুনলে কানে হাত দিতে হয়, যেসব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিন্দুশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থা ছাড়া, সমাজে থেকে সেই সব কাজ এরা অনায়াসে কোচে ।...সমাজ জানেন সব--দেখছেন সব--তবে এরা বড় বনেদি লোক, কাজেই মুখ ফুটে কিছু বলবার উপায় নাই।'^{১৪২}

বড়ঘরের কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক এবং লজ্জিত হয়ে তারই সাপেক্ষে সে এও বলে 'দরিদ্র লোক যারা, তাদের সতীত্ব, তাদের ধর্মই শ্রেষ্ঠ। তাদের জন্যই সংসার আছে।'^{১৪৩} এখানেই আরও একবার তথাকথিত উচ্চ আর নিম্নবর্গের পারস্পরিক সংঘাতের ঝলক ধরা পড়ে। উচ্চবর্গের আধিপত্যের চাপে সবদিক থেকে ধ্বস্ত নিম্নবর্গ সুযোগ পেলেই প্রতিপক্ষের বিকৃত চেহারা তুলে ধরতে চায়, দেখিয়ে দিতে চায় মুখোশের আড়ালে থেকে যাওয়া প্রকৃত মুখটাকে। কাহিনি বুনন বা ভাষার ঐশ্বর্যে গুপুকথাগুলি অনেক সময় দুর্বল বলে প্রতিপন্ন হলেও একে একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া অনুচিত। কারণ সাহিত্যিক মূল্য তেমন না থাকলেও এগুলির সামাজিক মূল্য অস্বীকার করার উপায় নেই। অনেক সামাজিক ব্যাধির মূলের সন্ধান এসব রচনার মধ্যে মিলে যাবে সেকথাও খোলা মনে মেনে নেওয়াই ভালো।

নতুন নগর কলকাতা : Heaven না Hell?

বটতলার সাহিত্যিকদের রচনায় ধরা পড়েছে নতুন নগরের প্রদীপের তলার অন্ধকারটাও। সে নগর কলকাতা নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র নয়, বরং তা জাল, জুয়াচুরি, পাপ আর মিথ্যায় পরিপূর্ণ এক নরককুণ্ড। চারিদিকে সেখানে যেন বদমাইশির ফাঁদ পাতা। সেখানে সমস্ত সুস্থ মানবিক বোধ অবসিতপ্রায়। কলকাতা শহরে এসে এক লম্পটের সঙ্গে মিশে সাধুরও কেমন সাধুত্ব নাশ হয়েছে তার বিবরণ আছে 'রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলকাতা' নামক রচনায়। কলকাতার রকমসকম দেখে সাধুর মনে সাধনপথের প্রতি বিরাগ জন্মেছে, মনে হয়েছে :

'ধর্ম্মপথে আর সুখ নেই আজ কাল ধর্ম্মপথে থাক্লেই যেন দুঃখ এসে অমনি ধরেছে, আমি ক্রমে ক্রমে সাধুর পথে যাব স্থির করে ছিলাম, দূর হউক আর সাধুত্বে কায নাই, সহরের

ভাব গতিক দেখে আমার মন কেমন২ করিতেছে একবার সহরের মজা লুটে দেখিইনা কেন। ²⁸⁸

সখের প্রাণ গড়ের মাঠ : উইকএন্ড এর মজা

ঔপনিবেশিক শাসনে যখন শহরে নানাবিধ চাকরির সুযোগ তৈরি হয় তখন বাঙালির জীবনে আরেকটা জিনিসের আবির্ভাব ঘটে। তা হল উইক এন্ড বা সপ্তাহান্তিক ছুটি। সারা সপ্তাহ কাজের পর শনি আর রবিবার তারা মেতে উঠতে থাকে ছুটির আমেজে। হুতোম জানাচ্ছেন এসব দিনে মনোরঞ্জনের নানাবিধ ব্যবস্থার কথা :

'আজ রবিবার। বারোইয়ারি তলায় পাঁচালি ও যাত্রা।...পাঁচালি ছোট কেতার হাফ আখড়াই, কেবল ছড়া কাটানো বেশীর ভাগ, সুতরাং রাত্তির একটার মধ্যে পাঁচালি শেষ হয়ে গ্যালো।'^{১৪৫}

তার পর শুরু হল আরো নানা মজা। আগে এই সপ্তাহ শেষের আমোদ বিষয়ে বাঙালির তেমন কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু স্বাভাবিক প্রবণতায় তারা সহজেই একে আত্মস্থ করে ফেলে। বটতলা থেকে এই বিষয়েই প্রকাশিত হয় 'কি মজার শনিবার', 'হদ্দ মজা রবিবার' জাতীয় রচনাগুলি। চন্দ্রকান্ত শিকদার প্রণীত 'কি মজার শনিবার' শুরুই হচ্ছে শনিবারের তুমুল আমোদের বর্ণনা দিয়ে :

'ধন্য কক্ষেতার সহর ধন্য শনিবার। বোতল ধরে আচ্ছা করে দিচ্ছে ক্যাবাহার।। সোণাগাজি উড্ছে ধ্বজা, বড় ধূম পুড্ছে। গাঁজা, মদ খেয়ে করছে মজা, মেছুয়া বাজার।। হাড়কাটা হেসে খেলে, গ্ল্যাস ধরে মুখে ঢেলে। অবশেষে বল্ছে বুলি, ক্যায়ছা মজেদার।।''

আবার শ্যামাচরণ শান্যাল প্রণীত 'হদ্দ মজা রবিবার' এর শুরুটাও প্রায় একই ধরনে, সেখানে রাগিণী সখের প্রাণ, তাল গড়ের মাঠ :

> 'ধন্য কক্ষেতা সহর ধন্য রবিবার। ঘরে ঘরে লুটচে মজা গাইয়ে বাহার।। অলিগলি যথা যাই, কত মজা দেখ্তে পাই, এমন সহর দুটি নাই, রসের আধার।''

তারপর গোটা বই জুড়ে রবিবারের আমোদের বর্ণনা দেওয়ার পর উইক এন্ড শেষে গতে বাঁধা ছকে প্রবেশের বর্ণনা :

'এদিকেতে রবিবার হল পরিশেষ। চুকে গেল বাবুদের অশেষ আয়েস।। তাড়াতাড়ি ধড়াচূড়া পরিধান করি। অফিসেতে যান সবে স্মরিয়ে শ্রীহরি।।'^{১৪৮}

এখন যা প্রাত্যহিকতায় বা অভ্যাসে পর্যবসিত হয়েছে, তখনকার দিনে তা-ই ছিল অভিনবত্বের দাবিদার। তাই সপ্তাহান্তের ছুটি ফুরনোর দুঃখেও লেখা হত 'কি দুঃখের সোমবার'এর মত রচনা।

এ বি শিখে বিবি সেজে বিলিতি বোল কবেই ক'বে : প্রসঙ্গ নব্যনারী ও বটতলা

নানা বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে মতামত দিয়েছে বটতলা তার চটি বইয়ের মাধ্যমে। তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উনিশ শতকের নারীচিন্তা প্রসঙ্গ। সমকালের স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকে রক্ষণশীলতার ধারকেরা ভালো চোখে দেখেনি। তারই ফলস্বরূপ 'পাসকরা মাগ' এর আখ্যাপত্রে দেখা মেলে এই পংক্তির 'স্ত্রী স্বাধীনের এই ফল/পতি হয় পায়ের তল।' সেখানে নায়িকা কিরণশশী চরম উদ্ধত্যে ঘোষণা করে:

'ড্যাম ন্যাষ্টি নেটিভগণ, মেয়েমানুষের অনার বোঝে না। ভাতার বলে যে, একটা পদার্থ আছে---কি জানোয়ার আছে---তা আমার আইডেয়াতেই আসে না;---তা আমি কি ইস্টুপিট নেটিভ পুরুষের অধীনতা স্বীকার করে---ব্রুট, অসভ্য, পরাধীন বাঙ্গালীর মতন থাক্বো?'^{১৪৯}

কিন্তু নানা ঘটনার ঘনঘটার পর তার উপলব্ধি:

'প্রথমে যখন আমার শশীবাবুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল, সেই সময় যদি হিন্দুয়ানী মতে থেকে সংসার কর্ত্তেম তা হলে আজ আমি রাজরানীর মতন হয়ে, পতি পুত্র নিয়ে সুখে থাকতাম...' ইত্যাদি।

রাখালদাসের 'অবলা-ব্যারাক' প্রহসনে নারী-স্বাধীনতা এবং ব্রাহ্মসমাজের মুগুপাত করা হয়। গোঁসাইদাস গুপ্তের লেখা 'বৌবাবু' প্রহসনেও নব্যযুগের বউকে দুর্বুদ্ধির আকর বলে চিহ্নিত করা হয়। যদিও এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করা দরকার। তা হল, তথাকথিত উচ্চবর্গীয়দের মধ্যেও কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রসঙ্গে মতভেদ ছিল। প্রগতিশীলেরা নারী অগ্রগতির পক্ষে সওয়াল করলেও রক্ষণশীলদের মধ্যে তখনও দ্বিধার অন্ত ছিল না। যেমন ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পারিবারিক প্রবন্ধ'তে লিখলেন :

'ছেলেরা ইংরাজী শিখিয়া সাহেব হইয়াছেন, মেয়েরা ইংরাজী না শিখিয়াই বিবি হইতে বসিল।...গৃহ এবং গৃহোপকরণ অপরিচ্ছন্ন থাকে, খাওয়া খারাপ হয়, শরীর মাটি হইয়া যায়, যে সকল সন্তান প্রসূত হয় তাহারা ক্ষুদ্রকায়, স্বল্পবল, রুপ্পদেহ হইয়া জন্মে...।'^{১৫১}

এরকম আরও উদাহরণের অভাব নেই। সুতরাং তথাকথিত শিক্ষিত মহলেই যখন দ্বিমত ছিল তখন এই বিষয়ে একা বটতলাকে দোষারোপ করা অনুচিত। জনমনের প্রতিচ্ছবিই তার পৃষ্ঠায় ধরা পড়েছে। রক্ষণশীল জনমনে এই বিপ্লব খুব ইতিবাচকতায় পর্যবসিত হতে পারেনি, তাই বটতলার বইগুলির পাতা জুড়ে মেয়েদের অন্যায়ের শান্তি বিধান করা হয়েছে। পাশকরা মাগকে বশে রাখার এক প্রাণান্ত প্রয়াস চোখে পড়ে সেখানে। এছাড়া ছিল মুন্সী নামদার এর 'কলির বউ ঘর ভাঙ্গানী', কাশীতে হয় ভূমিকম্প, নারীদের এ কি দম্ভ' জাতীয় রচনা, যেখানে সমাজের রক্ষণশীল চেহারার একটা ছাপ মেলে। অদ্রীশ বিশ্বাস বলছেন :

'এই বইগুলোর মধ্যে থেকে আমরা দেখতে পাবো সেই রক্ষণশীল সমাজটাকে, যেখানে সামাজিক অস্তিত্ব রক্ষার তর্কটাকে বটতলা কঠিন ভাবে আঁকড়ে ধরে লড়াই চালিয়ে গেছে। ওই সমাজ পরিবর্তনের উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিকোণের ঠেলায় সে যখন সাদরে আমন্ত্রণ পায়নি, তখন আরও প্রবল ভাবে নিজের বিপরীত অবস্থান নিয়ে সে সবের বিরুদ্ধে লড়ে গেছে। আধুনিকতা আসার নানা বন্দোবস্তের দিকে তাকিয়ে সে সন্দেহের সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছে, মেনে নিতে পারেনি। বটতলা সেই বিকল্প বয়ানটাকে হাজির করে বারবার। ফলে, বটতলার রক্ষণশীলতা অনেক সময়ে ভুল হলেও সেটা ছিল তার উনিশ শতকীয় আত্মপরিচয়ের অস্ত্র, যা নিয়ে সে লড়ে গিয়েছিল।'^{১৫২}

আসলে নারীবিষয়ক চিরন্তন ধারণার সঙ্গে যা মেলেনি, তার প্রতি সন্দেহ তো উচ্চবর্গের একটা গোষ্ঠীর মধ্যেও ঘনিয়ে উঠেছিল, যুগের হাওয়ায় নারী-অগ্রগতির এই ধারণা সমাজের কাঠামোকে ধ্বসিয়ে দেবে কিনা সে নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ত ছিল না। সেখানে তথাকথিত লোক-সাধারণের ধারণায় এই বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া হবে না, এমনটা আশা করাই অন্যায়। 'কাশীতে হয় ভূমিকম্প, নারীদের এ কি দম্ভ' রচনায় বলা হয়েছে:

'কলিকালে মেয়েদের খুরে দণ্ডবত। যেতে কাটে আস্তে কাটে সাঁকের করাত।।

ঘর কর্ত্তে ঝগড়া হয় সকলের বাড়ী।
ভাতারে দেখান ভয় গলে দিব দড়ি।।
ওঠ বল্তে তাড়াতাড়ি মায়ের বাড়ী ছোটে।
কলিকালের ছুঁড়ি গুণ বুড়ির কান কাটে।।'^{১৫৩}

অধিকাংশ সময়েই নারীকে সাব্যস্ত করা হয়েছে যাবতীয় সর্বনাশের মূল হিসেবে। নন্দলাল দত্তের 'অবাক কলি পাপে ভরা', রামকৃষ্ণ সেনের 'হুড়কো বৌয়ের বিষম জ্বালা'র মত রচনায় তার প্রমাণ মেলে। নারীমুক্তির কামনাকে কটাক্ষ করেই লেখা হয়েছিল 'মাগ সর্বস্ব', 'মেয়ে মনস্টার মিটিং', 'নভেল নায়িকা বা শিক্ষিত বউ' এর মত প্রহসন। আবার যেসব মুসলিম লেখক বটতলার বই লিখতেন তাঁরাও এই বিষয়ে রক্ষণশীল হিন্দুদের সঙ্গে একমত। হিন্দুরা যেমন নারী-স্বাধীনতা বিষয়ে স্পর্শকাতর ছিলেন এবং এগুলিকে কলিযুগের সর্বনাশা লক্ষণ হিসেবেই চিহ্নিত করেছিলেন, তেমনই মুসলিম লেখকেরাও একে 'আখেরি জামানা'র লক্ষণ হিসেবেই বিবেচনা করেছিলেন। নারীর স্বেছ্ছাচার সমাজকে ধ্বংস করে দেবে এ নিয়ে তাঁদের কোনো সংশয় ছিল না। তাঁরা নিশ্চিত যে হাল আমলের মেয়েরা 'বেহায়া আওরত'। তারা সুযোগ পেলেই 'করিবে হারামি জিনা বেগানার সাতে (বিবাহ বহির্ভূত অনাত্মীয়র সঙ্গে মিলন)।'^{১৫৪} সুতরাং 'দশ হাত কাপড়ে নেঙটা' মেয়েমানুষের কাছে এ অতি আনন্দের সময়, যখন সে বিনা বাধায় তার সমস্ত কামনা পূরণ করে নেবে। হার্দিকব্রত বিশ্বাস এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন:

'নকশা, কেচ্ছা, প্রহসন, প্রবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমেই স্ত্রী-শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রশ্নগুলিকে চটুল রসিকতার বিষয় করে তোলা হয়। ধরে নেওয়া হয় দাম্পত্য প্রেমের ভাবনা, শিক্ষা, সাজপোশাক পাশ্চাত্যের অনুকরণ, পতি বাছাইতে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাব, গৃহকর্মের প্রতি অবজ্ঞা, ইত্যাদি রোগের সমাহার একমাত্র মহিলা ও শিক্ষিতা রমণীর শরীরেই বাসা বাঁধতে পারে।'^{১৫৫}

নগরে নারীর পণ্যায়ন : 'পিরিতের টাকা টাকা সের'

আরেকটি বিষয় সেকালের বটতলাকে নতুন নতুন রচনার জন্ম দিতে সাহায্য করেছিল, তা হল চৌদ্দ আইন। বেশ্যা-সংসর্গে যৌনরোগ ছড়ানো বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই আইনের আগমন। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলার আগে এটা বলে রাখা দরকার যে উনিশ শতকের কলকাতায় বেশ্যা-প্রসঙ্গ ছিল একটি বহু চর্চিত বিষয়। বিশেষ করে নতুন নগরের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে যাদের বিত্তগত উত্থান ঘটেছিল তাদের মধ্যে অনেকেই বেশ্যাসক্ত ছিলেন। উপপত্নী রাখার রীতিমতো চল ছিল এবং এ নিয়ে বাবুদের

পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অন্ত ছিল না। এই সুযোগে কলকাতায় পৃথিবীর আদিমতম পেশা জাঁকিয়ে বসবে, তাতে আর সন্দেহ কিসের? সোনাগাজি (যা বহুক্ষেত্রেই পরে সোনাগাছি হিসেবে পরিচিত হয়েছে) হয়ে উঠেছিল বেশ্যাদের উপনিবেশ। দেনা পাওনার বাজারে কাঞ্চনমূল্যে সেখানে মিলত নারীসঙ্গ। অর্থমূল্যের নিরিখে তার আবার মাত্রাভেদ ছিল। তাই সেকালের গানে উল্লেখ আছে:

'সোনাগাজি বাজার পিরিতের, পিরিত টাকা টাকা সের, (যত) শুকো চিমসি, রুখো আমসি, ভাপনাতে জাহের;'^{১৫৬}

সমসাময়িক তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে '১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় বারবনিতার সংখ্যা ছিল ১২,৪১৯ জন, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় ৩০,০০০ এর মতো। '১৫৭ বাবু সম্প্রদায়ের বিলাস আর ব্যভিচারের দিকে ইঙ্গিত করে হুতোম প্যাঁচার নকশাতে কালীপ্রসন্ন সিংহ উল্লেখ করেছেন:

'বেশ্যাবাজিটি আজকাল এ শহরে বাহাদুরের কাজ ও বড়মানুষের এলবাত পোশাকের মধ্যে গণ্য…কলকাতা শহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যাশহর হয়ে পড়েছে, এমন পাড়া নাই যেথায় অন্তত দশঘর বেশ্যা নাই; হেথায় প্রতি বৎসর বেশ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে বই কমছে না।'^{১৫৮}

এই বেশ্যাদের মধ্যেও উচ্চ, মধ্য, নিম্নের শ্রেণি বিভাজন ছিল। সমস্ত বেশ্যার পরিস্থিতি একরকম ছিল না। সকলের ধনী বাবুর রক্ষিতা হওয়ার সুযোগ থাকত না, তাছাড়া যেহেতু এই ব্যবসায় দেহই প্রধান মূলধন কাজেই রূপ যৌবন চলে গেলে তাদের অন্ন জোটা মুশকিল হত। যেসব বেশ্যা 'বাঁধা মেয়েমানুষ' ছিল, তারা বাবুদের অনুগ্রহে স্বচ্ছল জীবন কাটালেও সর্বভোগ্যা বারাঙ্গনাদের অবস্থা ততটা অনুকূল ছিল না। তাই যেনতেন-প্রকারেণ 'নাগর' এর সমস্ত মনোযোগ দখলের মরিয়া প্রচেষ্টায় নামতেই হত তাদের। এমনকি এখানেও প্রতিদ্বন্দিতার অন্ত ছিল না, বারাঙ্গনা-সমাজের আকাশেরও রূপ-যৌবনের জোয়ারভাটার নিরিখে নক্ষত্রদের উদয়-বিলয় হত। সেই সময়ের বারাঙ্গনার মনের কথাও ধরা পড়ে সেকালের নানা রচনায়। যেমন 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় বারাঙ্গনার গীতে কোথায় যেন সেই অনুযোগের ছোঁয়া:

'এখন কি আর নাগর তোমার আমার প্রতি, তেমন আছে। নতুন পেয়ে পুরাতনে তোমার সে যতন গিয়েছে।'^{১৫৯}

শিষ্ট সমাজের প্রায় সকলের চোখে বেশ্যারা প্রতারক, ছলনাকারিণী। সাধারণ মানুষের মনেও তাদের সম্পর্কে অবিশ্বাসের ছবিটি স্পষ্ট। বেশ্যাদের মায়াবিনী ভাবা যত সহজ, রক্ত মাংসের মানুষ ভাবা ততটাই কঠিন। তাই বিনোদিনী দাসী (১৮৬২-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর আত্মকথায় আক্ষেপ করেছিলেন :

'পতি-প্রেম সাধ আমাদেরও আছে, কিন্তু কোথায় পাইব? কে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তে হৃদয় দান করিবে? লালসায় আসিয়া প্রেমকথা কহিয়া মনোমুগ্ধ করিবার অভাব নাই, কিন্তু কে হৃদয় দিয়া পরীক্ষা করিতে চান যে আমাদের হৃদয় আছে? আমরা প্রথমে প্রতারণা করিয়াছি, কি প্রতারিতা হইয়া প্রতারণা শিখিয়াছি, কেহ কি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন?'

বারাঙ্গনাবৃত্তির পরিণতি বিষয়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নববিবিবিলাস'এ উল্লেখ করেছিলেন :

'অগ্রে বেশ্যা পরে দাসী মধ্যে ভবতি কুট্টনী। সর্বশেষে সর্ব্বনাশে সারম্ভবতি টুককনী।।'^{১৬১}

কাজেই বেশিরভাগ সময়ে জীবন আর জীবিকা নির্বাহের তাগিদে বেশ্যারা তাদের বাবুদের নানাভাবে ছলনা করত। এমনকি একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি, অনেকক্ষেত্রে এক বেশ্যার দাসে পরিণত হত। দেব্জিত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ) জানাচ্ছেন:

'কলকাতা তথা বাংলার গ্রাম-শহরে বহু বাবুবাড়ির কামকৃষ্টিতে দেখা গেছে বেশ্যাগমন বা বেশ্যাভিলাষে জন্ম আর প্রজন্মের কোনও বাধ্যবাধকতা বা বাছবিচারের আবরু থাকত না। দাশরথি রায়ের আখ্যানে তারই ঝলক "জ্যেঠা খুড়া পিতা তনয়,-এক বেশ্যায় করে প্রণয়, এমন বাঁধে প্রেমে! করে মজা তলে তলে, ছেলেকে রেখে খাটের তলে তার বাপকে লয়ে খাটে তুলে, ছাড়ে না কোন ক্রমে"।'১৬২

বটতলা যেহেতু প্রায় প্রতিটি সাময়িক বিষয়কে তুলে ধরেছিল তাই বেশ্যাপ্রসঙ্গও বাদ যায়নি। সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ্যাদের নিয়ে অদ্ভুত একটা ফ্যান্টাসি ছিল। তারা যেন স্বপ্ললোকের কুহকিনী, দূর থেকে তীব্র আকর্ষণ আর কাছে গেলেই ধনেপ্রাণে বিনাশ--- এরকম একটা ধারণা তখন জনমনে ছিলই। কাজেই বটতলার অনেক চটি বই জনতাকে এই কুহক সম্পর্কে সচেতন করে দিতে চেয়েছে। বারাঙ্গনার চাতুরী বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করার জন্য রচিত হয়েছে 'বেশ্যাই সর্ব্বনাশের মূল' জাতীয় রচনা। ইতিমধ্যে নতুন শিক্ষা এবং চেতনার ফলে বেশ্যা সম্পর্কে শিক্ষিত মানুষের একটা বিরাগ জন্মাতে শুরু করেছে। ভদ্রলোক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষেরও ধারণা

বদ্ধমূল হয়েছে যে বেশ্যারা 'মনুষ্য শোণিতপায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী'। নানাবিধ নাটকে, প্রহসনে, সংবাদপত্রে বারবার এই ছবিটাই তুলে ধরা হয়েছে যে বেশ্যারা ছল-চাতুরী করে পুরুষদের নিঃস্ব করে দেয়। 'বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি' প্রহসনে যেমন প্রিয়বাবুর রক্ষিতা বেশ্যা হেমলতা ও তার মা সৌদামিনীকে দেখানো হয়েছে ছলনাকারিণী হিসাবে, আর প্রিয়বাবুর বন্ধু কেদারবাবু বেশ্যা সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন :

'ওরা অর্থের লোভে সকলি কত্তে পারে, এমন কি ধন পেলে জীবন পর্যন্ত বিনাশ করে।'^{১৬৩}

'হরিদাসের গুপ্তকথা'তে সোনাগাছির বেশ্যাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক জানাচ্ছেন :

'বেশ্যা মানে নগরবিলাসিনী বারাঙ্গনা; সুখবিলাসী মতিচ্ছন্ন যুবাদলের চিন্তমোহিনী-বিলাসিনী; এরা সব জঘন্য বিলাস-রসিক যুবাপুরুষের ইহকাল পরকাল ভক্ষণ করে। চিৎপুর রোডে দাঁড়িয়ে পূর্বের সেই শোনা কথাটা আমার মনে পোড়লো; স্থির কোল্লেম, এরাই তবে সেই সকল যুবকনাশিনী বিলাসিনী বারাঙ্গানা।...নগরের বিলাসিনীরা শত্রী জাতিসুলভ লজ্জাসম্ভ্রমের মস্তকে পদার্পণ কোরে, হেসে হেসে সদররাস্তার ধারে বাহার দিচ্ছে! আকার-অবয়বে ঠিক মানবী, কিন্তু ব্যবহারে এরা দানবী-পিশাচী।'^{১৬৪}

শুধু বটতলার লেখকরা নন, কলকাতার বেশ্যাদের রীতিনীতি বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যখন ভদ্রশ্রেণির কেউ কলম ধরেছেন তখন তাঁরাও কেমনভাবে বেশ্যারা বাবুকে নিজের কাবুতে আনত তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। যেমন 'নববিবিবিলাস' এ বেশ্যার ছয়ি 'ছ' এর উল্লেখ করেছেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'ছলনা, ছেনালি, ছেলেমি, ছাপান, ছেমো, ছেচড়ামি।'^{১৬৫} আবার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' তে খানকীদের আটকাণের কথা বলেছেন : 'ঠাট, ঠমক, চটক, চাল, মিথ্যা, মান, কান্না, গাল।'^{১৬৬} আসলে আমাদের মনে রাখতে হবে বারাঙ্গনার শ্রেণিচরিত্র। এসব তাদের শিক্ষারই অঙ্গ ছিল। এদিকে উনিশ শতকেই ক্রমশ বেশ্যা বিরোধিতা বেড়ে উঠতে থাকে। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৯/১১/১৮৫৬ তারিখে সংবাদপত্রে চিঠি লিখে বেশ্যাদের বসতি নগরের একপ্রান্তে সীমাবদ্ধ করার আর্জি জানান। তাঁর মতে :

'বারযোষাকুল সমস্ত রাত্রি মদ্যপান দ্বারা গীতবাদ্যাদির কোলাহলে এত উৎপাত আরম্ভ করে যে ভদ্রলোকমাত্রেই উক্ত পল্লীতে শয়নাগার ত্যাগ করণে বাধ্য হন...আপনারা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতির আজ্ঞা করুন নতুবা কোন প্রকারেই ভদ্র ধনবানগণ এই বিশাল ধনপূর্ণ ভদ্রনগর বাসের উত্তম স্থল বোধ করিতে পারেন না' ৷ ১৬৭

শুধু তাই নয়, শিক্ষিত ভদ্রলোকদের অন্য একটি ভীতির কারণও ছিল। ভদ্রঘরের আশেপাশে বেশ্যারা থাকলে :

'কেবল পুরুষেরা কুপথগামী হয় না, অনেক অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী এই কুদৃষ্টান্ত দ্বারা ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুতা হয়।...আপনারা কারারুদ্ধ থাকিয়া বেশ্যাদিগকে যখন সম্পূর্ণ স্বাধীনা দেখে, অনেকে যখন স্বীয় পতিকে তাহাদিগের প্রমোদে আসক্ত দেখিতে পায়, তখন সুখন্রমে কুকর্ম্মের লালসা তাহারদিগের চিত্তে প্রজ্বলিত হওয়া কি অসম্ভব?'

অর্থাৎ ঘরের মেয়েদের শুচিতা আর সুরক্ষার স্বার্থে, পরিবারের সম্মানের স্বার্থে ভদ্রলোকেরা এই পদক্ষেপ গ্রহণে আরও বেশি ব্যগ্র হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নগরের বেশ্যাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারের তরফ থেকে আইন পাস করানো হয়েছিল। আর এই আইনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন সমকালের তথাকথিত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এদিকে এই আইনের ফলে বেশ্যাদের জীবনজীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। আর তাঁদের এই বিপন্নতাকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একদল সর্বশক্তি নিয়ে বেশ্যা বিরোধিতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আর অন্যদল বেশ্যাদের দুর্গতি অনুভব করে তাদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। এই বিষয় নিয়ে বটতলা থেকে নানা লেখালিখি প্রকাশিত হয়েছিল। আবার অনেক বটতলার লেখক এই আইনের ফলে বেশ্যাগমনকারী পুরুষরাও জন্দ হবে এরকম মতামত দিয়ে পুন্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। যেমন প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁর 'বদ্মাএস জন্দ' প্রহসনে উল্লেখ করেছিলেন:

'নিছক রাঁড়েরা জব্দ হবে না লোচ্চাদের জব্দ কর্বার জন্যই হয়েচে এর নাম তো চোদ্দ আইন নয় বদ্মাএস জব্দ আইন।'^{১৬৯}

দেখা যাচ্ছে যেটুকু সমর্থন বেশ্যারা লাভ করেছিল তা মূলত এই বটতলার অখ্যাত বা অল্পখ্যাত লেখকদের কাছ থেকেই। কলকাতার শিক্ষিত সমাজের চোখে বেশ্যাবৃত্তি এতই নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য ছিল যে তাঁরা এর বিরুদ্ধে খড়গহস্ত ছিলেন। বিশেষত গণিকাবৃত্তির ওপর সবচেয়ে বড় আক্রমণ হয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহের সময় থেকে কলকাতাকে রক্ষা করার জন্য প্রচুর সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু বেশ্যাগমনের ফলে সৈন্যদের মধ্যে যৌনরোগের হার বাড়তে থাকায় চিন্তিত ইংরেজ সরকার ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম 'ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট'

প্রবর্তন করেছিল। পরে তারা অনুভব করে সেনাশিবিরের বাইরে গিয়েও যাতে সমস্ত বেশ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তেমন একটা আইন প্রয়োজন। সুতরাং পাশ হয় 'Contagious Diseases Act, XIV of 1868'; আর ইংল্যান্ডে পাশ হওয়া এই আইনের সূত্র ধরে এখানে পাশ হয় 'Indian Contagious Act' বা সংক্ষেপে 'চৌদ্দ আইন'। কলকাতায় তখন প্রায় ৩০০০০ বেশ্যা ছিল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই এই আইন তাদের মাথায় ভেঙে পড়ে। এই আইনে প্রত্যেক বারাঙ্গনাকে ডাক্তারি পরীক্ষা দিতে হত। এক্ষেত্রে:

'The key element of this measure was the compulsory examination of the women suspected of having venereal disease. As such the Act became more binding for the prostitutes than their clients.' ²⁹⁰

তারা রোগমুক্ত কিনা জানার পর রেজিস্ট্রেশন করানো বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু এই পরীক্ষাটি একটি নিগ্রহে পরিণত হয়। পুলিশ সরকারি নির্দেশে বেশ্যাদের জোর করে পরীক্ষা করাতে নিয়ে যেত। 'বাহবা চৌদ্দ আইন' রচনায় সেই পরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ উঠে এসেছে বারাঙ্গনা নিস্তারিণীর অভিজ্ঞতা-সূত্রে। তাদের ওপর অত্যাচার এত বেড়ে ওঠে যে অনেকে সাময়িকভাবে পেশা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। অনেকে ছদ্মবেশ ধরে, অনেকে আবার ফরাসি শাসিত ফরাসডাঙায় পালিয়ে যায়। 'বেশ্যা বিবরণ' নাটকেই উল্লেখ আছে বেশ্যাদের সবাই মিলে 'ফয়েসডাঙা'তে পলায়নের ইচ্ছার কথা:

'সই লো সই সবে মিলে,

চল যাই পলাইয়ে, ফয়েসডাঙায় বাস করি।'^{১৭১}

আবার 'পাঁচালী কমলকলি'তে উল্লেখ আছে :

'পোড়া

আইনের জ্বালায়, কে কোথা পালায়, যারে পায় ডাক্তারখানায়, যায় গো লয়ে ।'^{১৭২}

তখন ভীত বেশ্যাদের অবস্থা :

'ধরাধরির ভারি ধূম, কারো চক্ষে নাহি ঘুম, গুম হয়ে ভেবে পায় না দিশে। বলে কিসে হব পার, এ পাপে এড়ান ভার সজনী লো রক্ষা পাব কিসে।।'^{১৭৩} আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এই 'চোদ্দ আইন'কে কেন্দ্র করেই উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। আর বেশ্যা সম্পর্কে শুচিবায়ুগ্রস্ত উনিশ শতকের বিদ্যোৎসমাজ প্রসঙ্গে মৌ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন :

'আসলে নগরায়নের ফলে যে নতুন অর্থনীতির উদ্ভব ঘটেছিল শিল্পকেন্দ্রিক সেই অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থায় গ্রাম-সমাজ ও পরিবারচ্যুত মানুষ যে বিনোদনের আশায় বেশ্যাদের কাছে যাবেন, এটাই আধুনিকতার অবধারিত পরিণতি, সে কথা বুঝতে পারেননি উনিশ শতকের বিদ্যোৎসমাজ।'^{১৭৪}

এই বিষয়ে গবেষক রত্নাবলী চ্যাটার্জির দেওয়া তথ্যপ্রমাণ অনুসারে জানা যাচ্ছে:

'William Acton, British medical authority on venereal disease, first conceptualized prostitution in terms of economic laws of supply and demand: The desire for sexual intercourse is strongly felt by the male on attaining puberty and continues through his life as an ever present sensible want...this desire of the male is the want that produces the demand of which prostitution is a result...in fact the artificial supply of a natural demand.'^{59@}

যেন-তেন-প্রকারেণ বেশ্যাদের নিয়ন্ত্রণ করার নামে একটা ভয়ানক দমন-পীড়নের পস্থা বেছে নেওয়া হয়েছিল। তার ফলে তাদের জীবনে নেমে এসেছিল জীবিকাচ্যুতির ভীতি। কেমনভাবে সমস্ত পক্ষই এই বেশ্যাদের দমন এবং নিয়ন্ত্রণে হাত মিলিয়েছিল সেই বিষয়ে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন :

'ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ক্ষমতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষমতা, উভয়-ই বেশ্যা সমাজকে যুগপৎ নিয়ন্ত্রণ ও অবদমনের গণ্ডির মধ্যে আনতে সচেষ্ট হয়েছিল। যৌনরোগের বিস্তৃতি রোধের জন্য Contagious Diseases Act, যা সে যুগে 'চোদ্দ আইন' নামে পরিচিত, আইনের বিধিবদ্ধকরণ, ঔপনিবেশিক ক্ষমতার পরিচায়ক। পাশাপাশি সারা উনিশ শতক ধরে বাঙালি ভদ্রলোক সমাজের বেশ্যা-বিরোধী প্রচার অভিযান, তদানীন্তন ভিক্টোরীয় শিক্ষাপ্রণালীর ক্ষমতার অভিব্যক্তি।' ১৭৬

চতুর্থ পরি চেছে দ

প্রসঙ্গ নব্য নাগরিকতা : আলোর ফাঁদে বন্দী মন

নতুন যুগের নতুন সামাজিক কাঠামোয় অনিবার্যভাবে এসে পড়ে নতুন নাগরিক নির্মাণের প্রসঙ্গ। নবজাগরণের ফলে মানুষের চিন্তা এবং চেতনায় আসে পরিবর্তন। তার ভাবনার দিগন্ত ক্রমশ বিস্তৃত হতে থাকে। পাশ্চাত্য জ্ঞান আর নব্য শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠতে থাকে একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষ। এতকালের রক্ষণশীলতার, কুসংস্কারের বাতাবরণ খসে যেতে থাকে। নব্য সম্প্রদায় নতুন সভ্যতার উদযাপনে মেতে ওঠে। কিন্তু তাতে একটা প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়। নতুন যুগ ও জীবনের দাবিতে সমূলে নিজেদের ঐতিহ্যকে উপড়ে ফেলা কতটা যুক্তিসঙ্গত? আসলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সাক্ষাতের প্রাথমিক পর্বে ছিল সংঘাতের ইঙ্গিত। নতুন আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া নতুন নাগরিক নতুনকে গ্রহণের তাগিদে অবলীলায় বিসর্জন দিচ্ছিল তার সমস্ত পূর্ব সংস্কার। গ্রহণ-বর্জনের অনুপাতের হিসেবটা তার তখনো সেভাবে রপ্ত হয়নি। ফলে অতীতের অস্তিত্বের ভিত উপেক্ষা করে প্রাথমিক পর্যায়ে তারা প্রভুশক্তির যাবতীয় আচার-বিচারকে মান্যতা দিয়েছিল সর্বতোভাবে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না এদেশে ইংরেজদের আগমনের অন্যতম শর্ত ছিল এদেশে বাণিজ্যে লাভবান হওয়া এবং সাম্রাজ্যবিস্তার। সুতরাং নব্য নাগরিক নির্মাণের ক্ষেত্রেও তারা এমন একটি ছাঁচের সৃষ্টি করেছিল যাতে তা তাদের শাসনব্যবস্থার অনুকূল হয়। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য করেছেন:

> 'ইংরেজশাসনের অধ্যায়ে, পরস্বাপহরণের অভিনব সব কায়দা-কানুনে, পুঁজির বিস্তার ও অনন্তর জমিদখলের যৌথ রবরবায়, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা লাভ করে বয়ঃবাদী নতুন এক শিরোপা : শিশু। ভাবটি হয়, প্রাজ্ঞ বিদেশিদের পালন-লালন ব্যতিরেকে ভারতীয়রা কোনোদিন 'শৈশব'-এর চৌকাঠ পেরোতে পারবে না।'^{১৭৭}

সুতরাং তাদের সাবালক হয়ে উঠতে গেলে উপযুক্ত শাসকের অধীনে থাকাই শ্রেয়। 'THE INTIMATE ENEMY' গ্রন্থে লেখক আশিস নন্দী (১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ) উল্লেখ করেছেন:

> 'The new concept of childhood bore a direct relationship to the doctrine of progress now regnant in the West. Childhood now no longer

seemed only a happy, blissful prototype of beatific angels...It increasingly looked like a blank slate on which adults must write their moral codes-an inferior version of maturity, less productive and ethical, and badly contaminated by the playful, irresponsible and spontaneous aspects of human nature'.

ভারতে কোনো কারণে নৈরাজ্য সৃষ্টি হলে বিপুল আর্থিক ক্ষতি হবে প্রভুশক্তির। তাই যেভাবেই হোক না কেন, উপনিবিষ্টের মনের দখল নিতেই হবে। আর তার পরিকল্পনাটিও ভারি চমৎকার। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় তা ব্যক্ত করেছেন এইভাবে :

'কেবল উপনিবেশবাদ কেন, মেকলে-ট্রেভেলিয়ানদের ভাবনায় ন্য়া-উপনিবেশবাদের রীতিপ্রকরণ-সংক্রান্ত চিন্তারও অক্ষট আভাস মেলে। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের ইংরেজি শিক্ষার সংস্রবে ইউরোপীয় মন্ত্রপাঠে প্রশিক্ষিত করা, এক নতুন বিশ্ববীক্ষার সন্ধান দেওয়া, এই পুনর্গঠন-পরিকল্পনার পয়লা পৈঠা। ট্রেভেলিয়ানের ভাষায় : 'The natives will not rise against us, because we shall stoop to raise them: there will be no reaction, because there will be no pressure.'..কেবল তাই নয়, উচ্চবৰ্গীয় মানুষদের কল্যাণে সেই আশ্চর্য শিক্ষা ক্রমশ চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ছড়িয়ে যাবে সমাজের সর্বস্তরে, রস জমাবে শেকড়ে। ট্রেভেলিয়ানের আন্তরিক কামনা, জ্ঞানের উন্মেষ হোক, কিন্তু জ্ঞানচক্ষ্ণ যেন না ফোটে। আর সে-কামনা চরিতার্থ করার হাতিয়ার আর কে, একদঙ্গল জ্ঞানপাপীই তো : 'ইংরেজিশিক্ষিত ইস্কুলশিক্ষক, লোকেরাই অনবাদক, হবে আমাদের লেখক।...তারাই যে জনসাধারণের নেতা।^{,১৭৯}

ফলে নিজেদের সামাজ্যের ভিত সুরক্ষিত রাখতে উপনিবেশের প্রভু আলোকায়নের ফাঁদ পাতে। আর নতুন নাগরিকেরা বিভ্রান্ত হয়ে তাতে পা দিতে দেরি করে না। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় আরো উল্লেখ করেছেন :

> 'ঔপনিবেশিক শক্তির স্বার্থেই দরকার ছিল এক তাঁবেদার শ্রেণির : শান্ত, পোষমানা, তল্পিবাহকদের দল। অনুগতরা লাভ করবে শাসকবর্গের উষ্ণ সাহচর্য, পাবে একসঙ্গে ওঠা-বসার

অনুমতি, আর পরিশেষে, প্রাপ্তিযোগের চরম শিখরে তাদের জন্যে থাকবে উপশাসকের মর্যাদা।...তারা স্বেচ্ছাতই লাঘব করবে শাসকদের ভার।^{১৯০০}

এই নতুন নাগরিকেরা আলোর ফাঁদে বন্দী। তাদের নাগরিক দায়িত্ববোধ এমনভাবে নির্মিত যে তারা নিজেরই কারাগারের রক্ষী হয়ে ওঠে বিনা বাক্যব্যয়ে। উপনিবেশের অধিবাসীদের ওপর চলতে থাকে নিরন্তর খবরদারি, সেই খবরদারির চাপ তারা যত আত্মস্থ করে, তার প্রভাব ততই গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়, ক্ষমতার অভিব্যক্তি তত অবাধ হয়। মানুষের মর্মমূলে যত পাকা হয় ক্ষমতার ভিত, ততই অসাড় হয়ে আসে ক্ষমতার ক্রিয়া-বিক্রিয়ার বোধ। অদ্ভতভাবে বাহ্যিক কোনো আইনি শাসন নয়, মান্ষের ব্যক্তিসত্তার বোধ নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে অন্তর্নিহিত বা অভ্যন্তরীণ এক প্রচ্ছন্ন শাসনের দ্বারা, যাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে সভ্যতা, শালীনতা বা বিবেক জাতীয় কিছু শব্দবন্ধ দিয়ে। আর তা পালন করার জন্য সে হয়ে ওঠে দায়বদ্ধ। নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য 'নাগরিকদের ক্রমশ স্বতশ্চল নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত করে তোলাই প্রতাপের লক্ষ্য, যাতে স্বশৃঙ্খলা সমাজে অবিসংবাদী নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।^{,১৮১} আসলে সমাজ কাঠামোয় ক্ষমতার অবস্থিতি অনেক বেশি জটিল এবং বহুস্তরীয়। শুধু তাই নয়, নব্য নাগরিকতার শর্তও কোনো না কোনোভাবে তার সঙ্গে জড়িত। আর যে বিপুল সংখ্যক জনতা এই নাগরিক নির্মাণের খাঁচার বাইরে থেকে যায় তাদের একটু একটু করে ঠেলে দেওয়া হয় প্রান্তের দিকে। তাদের আচার-বিচার, প্রথা, সংস্কার, সভ্যতা, সাহিত্য-সংস্কৃতি সবই সেই চক্রান্তের বলি হিসেবে প্রান্তে-বাসীতে পরিণত হয়। শাসক তার অননুমোদিত কোনো কিছুকেই পরিসর দিতে চায় না। প্রদীপ বসু জানাচ্ছেন:

'নাগরিক নির্মাণের ব্যাপারটা সাহিত্য সমালোচনার সঙ্গে আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। অর্থাৎ যখন আরেকটা ধারা আরেকটা গোত্রের সাহিত্যকে প্রান্তের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে; তার মানে হচ্ছে, নাগরিক তৈরি করার প্রক্রিয়ার ভেতর সেটাকে আর অন্তর্ভুক্ত করা যাচ্ছে না। আনা যাচ্ছে না এই কারণেই যে যদি সেটা আসে তাহলে মূলধারার প্রক্রিয়াটি বিদ্নিত হবে। এর মধ্যে রাষ্ট্রেরও একটা ভূমিকা আছে।...এই সাহিত্য কোনোভাবে রাষ্ট্রকে অন্তর্ঘাত করতে পারে। তার ফলে এটা বাতিল হতে থাকে এবং হয়েছে।'১৮২

এখানে উপনিবেশের প্রজাদের বিভক্ত করা হয়েছে এইভাবে : The childlike Indian : যারা innocent but willing to learn, masculine, loyal and thus

'corrigible', সুতরাং তাদের জন্য ব্যবস্থা এরূপ : 'Reforming the childlike through Westernization, modernization or Christianization.' আর এর বিপরীতে রয়েছে The childish Indian : যারা 'ignorant but unwilling to learn, ungreatful, sinful, savage, unpredictably violent, disloyal and thus 'incorrigible'. সুতরাং তাদের জন্য ব্যবস্থা এরূপ : 'Repressing the childish by controlling rebellion, ensuring internal peace and providing tough administration and rule of law'.' এই কারণেই আলোকবৃত্তের বাইরে থেকে যাওয়া জনতার শিষ্ট নাগরিকত্ব লাভ সম্ভব হয় না এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট বা আস্বাদিত সাহিত্য-সংস্কৃতিও মূলধারায় ব্রাত্য থেকে যায়। আর হয়তো এই কারণেই জনতার দরবারে এই নব্য নাগরিকদের যাবতীয় কার্যকলাপ নতুন নতুন বিক্ষোরণের মালমশলা যোগান দিতে থাকে।

নারী-পুরুষ সম্পর্কের মাত্রা বদল : আধিপত্য-আনুগত্যের নতুন অঙ্ক

শিষ্ট নাগরিক সমাজে নারী এবং পুরুষের সম্পর্কের সমীকরণও বদলাচ্ছিল। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন :

'ঔপনিবেশিক আবহে, বহির্দেশীয় অভিঘাতের ফলে, নারী-পুরুষ সম্পর্কের ধাঁচটাতেও বদল ঘটে, বিশেষত উচ্চবর্গীয় উচ্চবর্ণ সমাজে।...উচ্চবর্গীয় উচ্চবর্ণ সমাজে, অন্দর ও সদরমহলের মধ্যে জাগে নতুন সব টানাপোড়েন, বিবর্তিত হয় ঘর ও বাইরের পারস্পরিক যোগ, আলগা হয় যৌথ পরিবারের বাঁধন, মেয়েদের ঘিরে তৈরি হয় নানান মতাদর্শগত আবর্ত।'' ১৮৪

আসলে এই শিষ্ট নাগরিক নির্মাণের ধারায় প্রথম লক্ষ্য যদি হয় বহির্মহল, দ্বিতীয় অবশ্যই অন্দরমহল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে দীর্ঘদিন সদর এবং অন্দরের রুচিগত বৈষম্য ছিল প্রকট। বাইরে ছিল নবজাগরণের আলো আর অন্দরে ছিল অজ্ঞতা আর অশিক্ষার আঁধার। কিন্তু যুগের দাবিতেই সম্রান্ত ঘরের মহিলাদের সাংস্কৃতিক রুচির বদল শুরু হয়েছিল। নব্যশিক্ষিত স্বামীদের প্রয়োজন অনুসারে তাঁরা নিজেদের নতুন করে গড়ে নিচ্ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে 'প্রাচীনা এবং নবীনা'তে উভয়ের তুলনা করে কিছুটা রসিকতার ছলেই আগেকার 'প্রাঙ্গণবিহারিণী রসবতী'দের প্রসঙ্গে বলেছেন :

'তাঁহারা "পোড়ারমুখো" "ডেক্রা" ইত্যাদি নিপাতনসাধ্য শব্দ আধুনিক প্রাণনাথ প্রাণকান্তাদির স্থলে ব্যবহার করিতেন, এবং "আবাগী" "শতেক খুয়ারী" প্রভৃতির শব্দ আধুনিক "সখী" "ভগিনী" স্থলে প্রয়োগ করিতেন।" কিন্তু তাঁদের রুচির কিছু সংস্কার হওয়ার ফলে "কলকণ্ঠধ্বনি পাপিয়ার মত গগনপ্লাবী না হইয়া মার্জারের মত অস্ফুট হইয়াছে। পতির নাম এক্ষণে আর ডেক্রা সর্বনেশে নহে, তত্তৎস্থানে সম্বোধনপদসকল দীনবন্ধুবাবুর গ্রন্থ হইতে বাছিয়া বাছিয়া নীত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে।"

মোদ্দা কথা এই পর্বে নতুন ছাঁচের ভদ্রমহিলার মডেল নির্মিত হয়েছিল। তবে এর পেছনেও কাজ করেছিল কিছু জটিল অঙ্ক। মেকলে সাহেবের মস্তিষ্কপ্রসূত বাদামি সাহেবরা অনুভব করেছিল সদর আর অন্দরের মধ্যে উপযুক্ত সেতু নির্মিত না হলে আধুনিকতার আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। কাজেই সমাজ-পুরুষ নির্দেশিত পথে শুরু হয়েছিল পুরুষতন্ত্রের আকাজ্কিত নারী-প্রতিমার নির্মাণ। সেই নারীর কাছে পুরুষ-তন্ত্রের চাহিদা ছিল এটাই যে নব্যশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একদিকে যেমন তারা হয়ে উঠতে পারবে আগামী প্রজন্মের উপযুক্ত ধাত্রী, তেমনই শিক্ষিত নারী গৃহকোণ পবিত্র রেখে হয়ে উঠবে প্রচলিত শৃঙ্খলার সেবিকা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন:

'In a country like India, where the nurseship (if I may so call the office of a nurse) generally devolves on the mother, the importance of educating the females...is very great; for unless they are enlightened, they spread the infection of their ignorance in the minds of those they bring up. Extensive dissemination of knowledge amongst women is the surest way that leads a nation to civilization and refinement."

নব্য শিক্ষার আলোকে যে নতুন নারী নির্মিত হবে তার ব্লু প্রিন্ট প্রগতিশীল বাঙালি তৈরি করেই রেখেছিল। কৈলাসচন্দ্র বসু এক বক্তৃতায় বলেছিলেন :

'woman has but one resource---Home. The end and aim of her life is to cultivate the domestic affections, to minister to the comfort and happiness of her husband, to look after and tend her children....She must be refined, reorganized, recast, regenerated.'

পরবর্তীতে শিক্ষিতা মহিলাদের মননে, চেতনায় এই মূল্যবোধগুলিই গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। সমকালের মহিলা সাহিত্যিকদের রচনা পর্যালোচনায় তার পরিচয় মেলে। স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু বা কামিনী রায়ের কথা বলা যেতে পারে। এরকম আরও উদাহরণ দুর্লভ নয়। সমালোচক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন:

'লোকসাহিত্যের রাধাকৃষ্ণের অবৈধ প্রণয় বা স্বাধীনা স্ত্রীর স্বচ্ছন্দচারিতার পরিবর্তে স্বামী ও সন্তানপালনের দায়িত্বের প্রতি আজীবন আনুগত্যই এঁদের রচনার মূল সুর হয়ে উঠেছিল।'^{১৮৮}

অন্তঃপুরের বাসিন্দাদের রুচির কাছে আন্তে আন্তে আগেকার রসরসিকতা, আমোদপ্রমোদ অস্বস্তিদায়ক হয়ে উঠছিল। ফলে রুচির বদল হয়ে পড়েছিল অবশ্যম্ভাবী। 'সুশীলার উপাখ্যান' বা 'বামাতোষিণী'র মত গ্রন্থ হয়ে উঠেছিল তাঁদের মনোগঠনে সহায়তা করার আয়ুধ। পুরুষের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নব্য নাগরিক সমাজের আলোকপ্রাপ্ত নারীকে একই সঙ্গে পূরণ করতে হচ্ছিল চিরন্তনী ও আধুনিকা হয়ে ওঠার অলিখিত শর্তগুলি। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' থেকে জানা যাচ্ছে সেকালের নব্যসম্প্রদায়ের স্ত্রী সম্পর্কিত চাহিদার কথা :

'নব্যসম্প্রদায় চায় স্ত্রীটি বাঙ্গালা বেশ জানে, ইংরেজীতে কথাবার্তা কহিতে পারে, সেলি-বায়রন পড়িতে পারিলে তো সোনায় সোহাগা। পিয়ানো বাজাইতে জানে, চিত্রবিদ্যায় নিপুণতা থাকে এবং বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিতে পারে। স্ত্রীতে এইসব গুণ থাকিলে তবে তাহাদের মন উঠে এবং হৃদয়ের আকাঞ্জার তৃপ্তি হয়।'^{১৮৯}

এর আগে অবধি অন্দরমহলেই ছিল নারীর যাবতীয় চলাচল, এমনকি মুখে বিপ্লব করার ঘোষণা করা বাবুরাও অন্দরের বিষয়ে ছিলেন উদাসীন। কিন্তু ক্রমে ভদ্রলোকের উপযুক্ত সঙ্গিনী হিসেবে অন্দরমহলের বাসিন্দাদের গড়ে পিঠে নেওয়া শুরু হতে থাকে। সমালোচক বলছেন:

'While Antapur (inner habitat) was marked as the fit place for the good woman—the mother and wife—by the traditionalists, the progressive advocated education for the Bhadramahila (ladies) and an entry into the public space as suitable partners of the Bhadralok (gentleman).'

এদিকে শিষ্ট নাগরিক সমাজের আলোকবৃত্তের বাইরে থেকে যাওয়া সমাজ নারীর এই নবরূপায়ণ এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের এই নব্য সমীকরণকে খুব একটা ভালো চোখে দেখেনি। তারা গতানুগতিকতার পক্ষেই ছিল বেশিরভাগ সময়ে। বৃহত্তর জনরুচির ধারক বউতলায় তাই বিশেষ করে মেয়েদের অগ্রগতিকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছিল। একদিকে মেয়েদের জন্য রচিত হয়েছিল 'পতিব্রতোপাখ্যান' বা 'দম্পতি-শিক্ষা'র মত পুস্তক। এখানে স্থিরীকৃত হয়েছিল বিবাহিতা নারীর কর্তব্য। আর অন্যদিকে শিক্ষিত নারীকে এমনভাবে কল্পনা করা হয়েছিল যাতে তারা ভিনগ্রহের বাসিন্দা হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। মনে হয় সমসাময়িক সমস্ত সংস্কারের স্রোত থেকে নিজ গৃহের রমণীদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখার জন্য এ ছিল রক্ষণশীল মানসিকতার ধারকদের মানসিকতার দর্পণ।

আন্দোলনের উন্মাদনা

উনিশ শতকের কলকাতার নব্য নাগরিকেরা নানা বিষয়ে আন্দোলন করেছিল যুগ আর জীবনের চিরাচরিত প্রথাবদ্ধতাকে ভাঙার জন্য। সমালোচক উল্লেখ করেছেন :

'In the 19th century Bengal was considered to be in the throes of a change by the rest of the country. A number of social reforms considered progressive by the civilising standards of the west, were the reason. The Bengali Hindus, in their passage from the Babu to the Bhadralok, assessed these reforms as their particular achievements.'

তবে এই আন্দোলন শুধু সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন নয়, উনিশ শতকের কলকাতা ধর্ম-আন্দোলন বিষয়েও আলোড়ন তুলেছিল। উনিশ শতকের ধর্মান্দোলন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই রচনার উদ্দেশ্য নয়। আমাদের আলোচ্য হল শিষ্ট বনাম অপরের সংঘাতের ইতিবৃত্ত রচনা। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, যে সমস্ত বিষয় নিয়ে উভয়পক্ষের সংঘাত বেধেছিল তার মধ্যে এই ধর্মও কিন্তু অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল সহজেই। আর নতুন রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে এই ধর্ম একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও নিয়েছিল। আসলে ইতিহাসে রাজনীতির যা ক্ষমতা, সমান্তরালভাবে সেই ক্ষমতা ধর্মেরও। তাই খুব সংক্ষেপে সেকালের ধর্ম-জনিত উত্তেজনার কথাটুকু তুলে ধরতে চাই। শাসক ইংরেজ আসার আগে দীর্ঘকাল মুসলিম শাসকের অধীনে থাকলেও সনাতন হিন্দু ধর্মের গরিমা বিষয়ে সমাজপতিরা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কিন্তু

এদেশে ইংরেজ শাসন পাকাপোক্ত হয়ে বসলে চিরায়ত হিন্দুধর্মের আচারসর্বস্বতা, পৌত্তলিকতা প্রশ্নের মুখে পড়েছিল। পাশ্চাত্যের সমস্ত কিছুকে নির্বিচারে গ্রহণের মানসিকতা চেপে বসায় যা যা আক্রমণের মুখে পড়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল সনাতন হিন্দুধর্ম। নানাবিধ সংস্কারে জর্জরিত হয়ে সেও তার আদিরূপ হারিয়েছিল তখন। ফলে নতুন আলোর দীপ্তিতে দীপ্তিমান নাগরিক সমাজের অনেকে আর তাকে মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না। বিশেষত হিন্দু কলেজ-ভুক্ত ডিরোজিয়ানরা সনাতন ধর্মে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। বিনা যুক্তিতে কিছুই মানতে তাঁদের আগ্রহ ছিল না। এই তরুণেরা তাঁদের কর্মে এবং চিন্তনে অচল সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের অনেকের মধ্যেই সংশয়বাদ এবং নাস্তিক্য মাথাচাড়া দিয়েছিল। সংস্কারের ব্যাপারে চরমপন্থী এই যুবসমাজের কার্যকলাপ সেকালে সমাজে বিশাল আলোড়ন তুলেছিল। ইতিমধ্যে মিশনারিরা খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে মেতে উঠেছিলেন। আলেকজান্ডার ডফ (১৮০৬-১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ) এর কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেসময় মিশনারিরা সাধারণ মানুষের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে উঠেপড়ে লেগেছিলেন। প্রভু যিশুর মাহাত্ম্য বোঝানোর জন্য তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সাধারণ জনগণের কাছে খ্রিস্টধর্মের মহিমা প্রচারের জন্য তাঁরা পথে নেমেছিলেন। কিন্তু ভাষা এবং সংস্কৃতি-জনিত ব্যবধান এক্ষেত্রে বেশ সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। মিশনারিদের বক্তব্যের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা এদেশের সাধারণ জনতার পক্ষে ছিল বেশ কঠিন। হুতোম প্যাঁচার নকশাতে এর চমৎকার বিবরণ আছে। সেখান থেকে জানা যাচছে :

'কোথাও পাদরি সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন---কাচে ক্যাটি কৃষ্ট ভায়া---সুবর্বন চৌকিদারের মত পোসাক--- পেনটুলন ট্যাংট্যাঙে চাপকান, মাথায় কাল রঙ্গের চোঁঙ্গাকাটা টুপি। আদালতী সুরে হাত মুখ নেড়ে খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ব্যক্ত করছেন—হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন পুতুলনাচের নকীব। কতকগুলো ঝাঁকাওয়ালা মুটে, পাঠশালের ছেলে ও ফ্রিওয়ালা এক মনে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্যাটিকৃষ্ট কি বল্চেন কিছুই বুঝতে পাচ্চে না।' ক্ষ

তার ফলে এটা সাধারণের কাছে একটা নতুন হুজুক হিসেবেই বিবেচিত হয়েছিল। খ্রিস্টধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভাবের এক সরস বর্ণনা আছে হুতোমের নকশায় :

'সহরে যখন যে পড়তা পড়ে, শীগ্গির তার শেষ হয় না; সেই হিড়িকে একজন ইস্কুল মাষ্টার কালীঘেটে হালদার, একজন বেনে ও কায়স্থও কৃশ্চান দলে বাড়লো---দুচারজন বড় বড় ঘরের মেয়েমানুষও অন্ধকার থেকে আলোয় এলেন! শেষে অনেকের চাল ফুঁড়ে আলো বেরুতে লাগ্লো, কেউ বিষয়ে বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অনুতাপ ও দুরবস্থার সেবা কত্তে লাগ্লেন। কৃশ্চানি হুজুক রাস্তার চল্তি লণ্ঠনের মত প্রথমে আশপাশ আলো করে শেষে অন্ধকার করে চলে গ্যালো। '১৯৩

এদিকে পারিপার্শ্বিক সমাজে প্রচলিত ধর্মের নামে আচারের অভ্যন্তরীণ দৈন্যে ব্যথিত হয়েছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক মানুষ। হিন্দুধর্মের প্রাচীন অযৌক্তিক সংস্কারগুলিকে সমূলে বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন তিনি। শাস্ত্রবিধির শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতার যুক্তিবাদকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ)। স্বজাতির অন্ধ সংস্কারের অচলায়তনে আঘাত হানার পাশাপাশি বিদেশি ধর্মযাজকদের অহতুক আক্রমণেরও তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। যেসব অন্ধবিশ্বাস হিন্দুসমাজকে কলুষিত করছে তার তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি খ্রিস্টধর্মের গোঁড়ামিকেও তিনি একহাত নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন:

'কী সংকটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন! তাঁহার একদিকে হিন্দুসমাজের তউভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর-এক দিকে বিদেশীয় সভ্যতাসাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুত-বেগে অগ্রসর হইতেছিল---রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খৃস্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মতো মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।' ১৯৪

স্বাধীন মত প্রকাশ করে পাদ্রিদের আক্রমণের মুখে পড়লে তিনি প্রত্যুত্তরে লিখেছিলেন 'An Appeal to the Christian Public' (1820), 'Second Appeal to the Christian Public' (1821) এবং 'Final Appeal to the Christian Public' (1823) এর মত রচনা। তিনি একেশ্বরবাদের কথা প্রচার করেছিলেন এবং ব্রহ্মসভা স্থাপন করেছিলেন। তারপরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যোগ্য উত্তরসূরিদের হাতে ব্রাহ্মধর্ম ক্রমবিকশিত হয়ে ধর্মের খাতে এক নতুন জোয়ার এনেছিল। কালক্রমে তা নানা উপমতে বিভাজিত হয়ে যায়। কিন্তু হিন্দুধর্মের আদি অকৃত্রিম ধারা এত সহজে বিলীন হয়ে যাওয়ার নয়। সনাতন হিন্দুধর্মের সংস্কারের ভিতকে আঁকড়ে থাকার জন্য 'ধর্মসভা'র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। যদিও মেকলে ১৮৩৬ খ্রিস্টান্দের ১২ই অক্টোবর এক পত্রে লিখেছিলেন :

'The effect of this education on the Hindoos is prodigious. No Hindoo, who has received an English education, ever remains sincerely attached to his religion. Some continues to profess it as a matter of policy; but many profess themselves pure Deists, and some embrace Christianity. It is my firm belief that, if our plans of education are followed up, there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty years hence.'

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে পুরোপুরি তা ঘটেনি। তাই একদিকে খ্রিস্টধর্ম এবং অন্যদিকে রাক্ষধর্ম---এই দুই বিরুদ্ধ শ্রোতের বেগে প্রথমে রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং এই শ্রোতকে রুদ্ধ করার প্রয়াসেই হিন্দুধর্মের সংস্কারের কাজ শুরু হয়। বিদ্রোহের তীব্রতা প্রশমিত হয়ে এলে বাংলা ভাষা আর সংস্কৃতির রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তারপর তার সূত্র ধরেই বাঙালি তার অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে, তার মধ্যে জাতিসন্তার বিকাশ ঘটে, স্বদেশপ্রীতির অন্ধুরোদাম হয়, উনিশ শতকের প্রথম পর্বের কালাপাহাড়ি আচরণ স্থিতথী বিচক্ষণতার পথ খুঁজে পায়। বাঙালি হিন্দুর জাতিসন্তা গঠনের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়। জাতীয় গৌরব পুনরুদ্ধারের আকাজ্ঞা দানা বাঁধতে থাকে। সমালোচক স্বপন বসুর অভিমত অনুযায়ী তখন 'ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা আত্মর্যাদা রক্ষার জন্য জাতিসূজনের প্রয়োজনীয়তা অনুতব করেন। জাতি তৈরি করতে গিয়ে কাঁচামাল হিসাবে তাঁরা ব্যবহার করেন হিন্দুত্বকে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ) বলেছিলেন:

'এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্রিত হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন ও একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা আমাদের পক্ষে কত উপকারী, তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। একদিন কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে

দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎকর্ম সাধন, অনেক উৎসাহবৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। ^{১১১৭}

এভাবে স্বদেশ-অনুরাগ প্রস্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিতের চোখে আন্তে আন্তে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের সমীকরণটি ফুটে উঠতে থাকে। তবে প্রথম পর্বে পাশ্চাত্যের সমস্ত প্রথার হুবহু অনুকরণ থেকে শুরু করে পরবর্তীতে আবার স্বদেশি সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠার চেষ্টা করা তথাকথিত ভদ্রশ্রেণি যতই নিজেদের মতাদর্শকে বিজ্ঞাপিত করুক না কেন, তথাকথিত অপরের চোখে তার এসব আচরণ অন্তঃসারশূন্য হিসেবেই বিবেচিত হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। সেই অপর অভিধা-ভুক্ত মানুষগুলো এই ইয়ং বেঙ্গল থেকে ব্রহ্মজ্ঞানী, খ্রিস্টান পাদ্রি বা গোঁড়া হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী সবার অসঙ্গত আচরণের দিকেই আঙুল তুলেছে অবলীলায়। পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট ইয়ং বেঙ্গলদের ব্যঙ্গ করে তাই রচিত হয়েছে 'ইয়ং বেঙ্গল ক্ষুদ্র নবাব'এর মত পুস্তিকা। সেখানে তাঁদের বাহ্যিক আড়ম্বরকে বিদ্রূপ করে বলা হচ্ছে:

'পেন্টুলেন পোঁদে আঁটা মোজা পরা পায়। ওরেফ আস্তেন কাটা চাপকান গায়।।... চুলের কি কেতা আহা! বলিহারী যাই। সম্মুখেতে যত ঘাড়ে শিকি তার নাই।।... ঝাড়েন ইংরাজী বুলি কথায় কথায়। ইংলস্তে বরণ যেন এমন জানায়।।'১৯৮

আবার সেকালের আঙুল-ফুলে-কলাগাছ হঠাৎ বড়লোকদের অর্থের জোরে বর্ণবিন্যস্ত সমাজের উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠালাভের ইচ্ছাকেও ব্যঙ্গ করা হয়েছে সমানতালে। ইংরেজ কোম্পানির বেনিয়ান হয়ে রামদুলালের 'সরকার' উপাধিলাভকে কেন্দ্র করে তাই গান বাঁধা হয়েছে : 'দুলোল হল সরকার, ওক্কুর হল দত্ত/ আমি কিনা থাকব যে কৈবিত্ত, সেই কৈবিত্ত।'১৯৯ সেকালের নানা রচনায় এরকম অজস্র উদাহরণ মিলবে। এসব থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, নিত্যনতুন ঘটনার ঘনঘটায় সেকালের কলকাতা ছিল সরগরম। আর এসব ঘটনার অভিঘাত মানুষের ওপর কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত তার রঙিন সব ছবি ধরা আছে সমকালের নানা বৃত্তান্তে। কালের দলিল হিসেবে তাই তারা যথেষ্ট সামাজিক গুরুত্ব দাবি করে। উনিশের কলকাতার বুকে শিষ্ট বনাম অপর এর যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং সাহিত্যিক সংঘাত---এসব তার পাথুরে প্রমাণ। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন :

'উনিশ শতকের কলকাতার রাস্তা-ঘাট-বস্তি-বাজারের মানুষেরা সমসাময়িক সামাজিক জীবনের হাস্যকর অসংগতি দেখে নিজেরাই কৌতুক করতেন, ব্যঙ্গাত্মক গান বাঁধতেন, রাস্তায় সঙ

নামাতেন, কবির লড়াইতে বড়োমানুষদের নিয়ে বিদ্রূপ করতেন, ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষিত খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের বক্তৃতায় ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতেন, নিজেদের সমাজের ধার্মিক ভণ্ড-তপস্বীদের তীব্র উপহাসে নাস্তানাবুদ করতেন।'^{২০০}

যে উচ্চবর্গ চিরকাল জনতাকে তুচ্ছ করেছে, ব্রাত্য করে রেখেছে, আলোকবৃত্তের বাইরের এইসব সাধারণ জনগণের চর্চার মধ্যে থেকেই উঠে আসত উচ্চবর্গের কার্যকলাপের চাঁছাছোলা সমালোচনা। তবে কেবল প্রগতিশীলতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা অভিধায় এদের বিভাজন করে ফেলা অনুচিত। আমাদের মনে রাখতেই হবে যে একপক্ষের কাছে নবজাগরণের প্রথম আলোর তীব্রতায় ঝলসে যাওয়া চোখে যেমন অতীতের সব কিছুকেই বিবর্ণ দেখিয়েছিল, তেমনি আরেক পক্ষের কাছে গ্রামীণ জীবনের শিকড় উপড়ে আসার ফলে ফেলে আসা প্রথা, সংস্কারের বাঁধন উপেক্ষা করা বড় সহজ ছিল না। তার ফলে আলোকপ্রাপ্তেরা যেমন যাবতীয় দেশাচারের ধারক এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে অবহেলা আর অবজ্ঞার চোখে দেখেছিল, তেমনই এরাও সামাজিক উন্নতির প্রতিটি সোপানকেই প্রাথমিকভাবে সন্দেহের চোখে দেখেছিল। জটিল সেই সময়-আবর্তের প্রেক্ষিতেই তাই এই দ্বন্ধকে বিচার করতে হবে, করতে হয়।

উল্লেখপঞ্জি

- ১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, *মিশেল ফুকো, তাঁর তত্ত্ববিশ্ব,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃ ৮৫
- ২. ওই, পৃ ৮৬
- ৩. ওই, পৃ ৮৯
- 8. বিশ্বাস, হার্দিকব্রত, বঙ্গসমাজ সংস্কার, 'কালের কুহক' ও বটতলায় ছাপা মেয়েরা, অদ্রীশ বিশ্বাস ও অনিল আচার্য সম্পাদিত বাঙালির বটতলা, অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ ২৭৪
- ৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য,* কারিগর, কলকাতা, ২০০৩, পৃ ১১৬
- ৬. সমাচার দর্পণ ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩/ ১২ ফাল্পন ১২২৯ এ প্রকাশিত। তথ্যটি গৃহীত হয়েছে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ ৫৭ থেকে।
- ৭. বসু, স্বপন, আদিরসের বই : আইনের শাসন, বাঙালির বটতলা, পু ২০২-২০৩
- ৮. ঘোষ, বিনয়, বটতলার সাহিত্য, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, পূ ৩৯৬

- ৯. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর, লোকরহস্য, বঙ্কিম রচনাবলী ২,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ ৭২
- ১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, *দূতীবিলাস, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সংগ্রহ,* (সম্পাদনা রমেনকুমার সর), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ ১৯৫
- ১১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী ২,* পৃ ১০৮২
- ১২. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* নিউ এজ পাবলিকেশন প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ ১৩১
- ১৩. চক্রবর্তী, সুদেষ্ণা, *উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি জীবনে ভিক্টোরিয়ান প্রভাব,* স্থপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ ১২০-১২১
- ১৪. ঘোষ, অনিন্দিতা, বটতলার বই ও তার সামাজিক ইতিহাস, বাঙালির বটতলা, পৃ ৪৯
- ১৫. Long, J, A *Descriptive Catalogue of Bengali Works,* Calcutta, 1855. আমি তথ্যটি সংগ্ৰহ করেছি শ্রীপান্থের *বটতলা* গ্রন্থ পূ ৪০ থেকে।
- ১৬. শ্রীপান্থ, বটতলা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, নভেম্বর ২০১৩, পু ৪১
- ১৭. বিশ্বাস, হার্দিকব্রত, *বঙ্গসমাজ সংস্কার, 'কালের কুহক' ও বটতলায় ছাপা মেয়েরা,* পু ২৭৮-২৭৯
- ১৮. শ্রীপান্থ, *বটতলা,* পৃ ৪২
- ১৯. ওই, পূ ৩৯
- ২০. চটোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্ৰ, অঞ্লীলতা, বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ
- ২১. টমাস ব্যাবিংটন মেকলে, *মিনিট অন এডুকেশন,* কলকাতা ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ। আমি তথ্যটি সংগ্রহ করেছি যোগীন্দ্রনাথ বসুর *মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীবনচরিত* গ্রন্থ থেকে, পু ৩৩
- ২২. আমি তথ্যটি সংগ্রহ করেছি যোগীন্দ্রনাথ বসুর *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* গ্রন্থ থেকে, পৃ ৩৩
- ২৩. ওই, পৃ ৩৩
- ২৪. ওই
- ২৫. ওই
- ২৬. ওই
- ২৭. বসু, স্বপন, *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, অগাস্ট ২০১৬, পৃ ২০৮
- ২৮. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (চতুর্থ পর্যায়),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, জুন ২০১৪, পু ২২-২৩
- ২৯. ওই, পু ২৩
- ৩০. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা,* অরুণ নাগ সম্পাদিত সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০৩, পৃ ২৫১
- ৩১. গুপ্ত, বিপিনবিহারী, পুরাতন প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, অগস্ট ১৯৮৯, পু ২৪০

- •• De, Sushil kr., *History of Bengali Literature in the nineteenth century* 1800-1825, University of Calcutta, p. 302
- ৩৩. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা*, অরুণ নাগ সম্পাদিত সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা, পৃ ১০৪
- ৩৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* অনুষ্টুপ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ ৪৪
- ৩৫. শেঠ, হরিহর, প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়, প্রবাসী প্রেস হইতে মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৩৪১, পৃ ১৫০
- **99.** De, Sushil kr., *History of Bengali Literature in the nineteenth century* 1800-1825, University of Calcutta, p. 354
- ৩৭. বসাক, বৈষ্ণবচরণ, (সংকলিত), ভারতীয় সহস্র সঙ্গীত, পু ২৫৭
- ৩৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, পু ১৬২
- ৩৯. ওই, পৃ ১৬৪
- 80. ওই, পৃ ১৬৫
- 8১. মিত্র, দীনবন্ধু, সধবার একাদশী, মলয় রক্ষিত সম্পাদিত সধবার একাদশী পুনর্বিচার, অক্ষর প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১৫, পৃ ৬৩
- 8২. সমাচার দর্পণ ২৪ জানুয়ারি ১৮২৯/ ১৩ মাঘ ১২৩৫, তথ্যটি গৃহীত হয়েছে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ ৫৭ থেকে।
- ৪৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান,* পৃ ৫৩
- 88. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, হুতোম প্যাঁচার নকশা, পৃ ৮৯
- ৪৫. দত্ত, মহেন্দ্রনাথ, কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩, পৃ ৩০
- ৪৬. গুপ্ত, বিপিনবিহারী, পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ ২৩৭
- 8৭. ওই, পৃ ২৩৪
- ৪৮. ওই, পু ২৩৫
- ৪৯. দত্ত, মহেন্দ্রনাথ, *কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা,* পৃ ২৪-২৫
- ৫০. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, হুতোম প্যাঁচার নকশা, পু ৯১
- ৫১. গুপ্ত, বিপিনবিহারী, পুরাতন প্রসঙ্গ, পু ২৩৫-২৩৬
- ৫২. ওই, পু ২৫৯
- ৫৩. ভট্টাচার্য, গৌরীশংকর, *বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা,* কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২, পৃ ২৩৬-২৩৭
- ৫৪. দর্শকের চিঠি, সোমপ্রকাশ, ২২ বৈশাখ, ১২৭১। আমি তথ্যটি সংগ্রহ করেছি সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান* গ্রন্থ, পু ১১০-১১১ থেকে।
- ৫৫. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা,* পৃ ১০৫
- ৫৬. সোমপ্রকাশ, ২৩ চৈত্র, ১২৭০। আমি তথ্যটি সংগ্রহ করেছি সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান গ্রন্থ, পু ১১১ থেকে।

- ৫৭. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্ৰ, *বিষবৃক্ষ, বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র),* বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০২, পু ২৩৯
- ৫৮. স্বর্ণকুমারী দেবী, *আমাদের গৃহে অন্তঃপুরশিক্ষা ও তাহার সংস্কার,* প্রদীপ, ভাদ্র ১৩৫৬, *সাহিত্য* সাধক চরিতমালা, ২৮, পু ৭
- ৫৯. ঘোষ, বিনয়, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ড,* প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ ৭০১-৭০২
- ৬০. দত্ত, মহেন্দ্রনাথ, কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা, পু ২৯
- ৬১. শাস্ত্রী, শিবনাথ, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,* নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ
- ৬২. সুলভ সমাচার, ৭ ভাদ্র ১২৭৮। আমি তথ্যটি সংগ্রহ করেছি সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান গ্রন্থ, পু ১১৩ থেকে।
- ৬৩. বিবিধার্থ সংগ্রহ, ৫৮ খণ্ড, মাঘ শকাব্দ ১৭৮০। আমি তথ্যটি সংগ্রহ করেছি সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান গ্রন্থ, পু ১১০ থেকে।
- ৬৪. *যাত্রা, বঙ্গদর্শন,* প্রথম খণ্ড, কার্তিক, ১২৮০
- ৬৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, শ্রাবণ ১৪০৫, পৃ ১০৩
- ৬৬. তর্করত্ন, রামনারায়ণ, ভূমিকা, *রত্নাবলী।* আমি তথ্যটি গ্রহণ করেছি যোগীন্দ্রনাথ বসুর *মাইকেল* মধুসদন দত্তের জীবনচরিত গ্রন্থ, পু ১৫২ থেকে।
- ৬৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, পু ৯৪
- ৬৮. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, হুতোম প্যাঁচার নকশা, পু ৮৭
- ৬৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, পৃ ৩৪
- ৭০. বসন্তক, দ্বিতীয় পর্ব, দশম সংখ্যা, ১৮৭৪
- ৭১. চক্রবর্তী, শ্যামলী, *বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প ও সঙ্গীতের জগৎ,* অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জুলাই ১৯৯০, পৃ ১১১
- ৭২. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা,* পৃ ১০৩
- ৭৩. সাধারণী, ২১ অগ্রহায়ণ, ১২৮১। আমি তথ্যটি গ্রহণ করেছি সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান গ্রন্থের পৃ ৯১ থেকে।
- 98. Jones William and Willard N.A, *Music of India,* Calcutta, 1962, p. 3-13. আমি তথ্যটি সংগ্রহ করেছি শ্যামলী চক্রবর্তীর *বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প ও সঙ্গীতের জগৎ,* পু ১৪০ থেকে।
- ৭৫. মধ্যস্থ, পৌষ, ১২৮০। আমি তথ্যটি গ্রহণ করেছি সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের *উনিশ শতকের* কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান গ্রন্থের পৃ ১৯১ থেকে।
- ৭৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, পু ১৪০
- ৭৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল, বটতলা ও তার প্রহসন, বাঙালির বটতলা, পৃ ২৪৫
- ৭৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, পৃ ৫৩
- ৭৯. ওই, পৃ ৬৩
- ৮০. ওই, পৃ ১৫০
- ৮১. শেঠ, হরিহর, প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়, কলিকাতা, ১৩৪১, পৃ ৩২৭

- ৮২. ওই, পৃ ৩৩১
- ৮৩. বিশ্বাস, অদ্রীশ, কৌতুক শতক : বটতলার 'জোক বুক'-এ উনিশ শতকের স্বরূপ নির্ণয়, বাঙালির বটতলা, পু ৩৫৫
- ৮৪. নাথ, মৃণাল, উনিশ শতকে বাঙালির বাংলা ভাষাচর্চা : ঔপনিবেশিকতার ব্যাকরণ এবং, উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, পৃ ৪৭০
- ৮৫. ঘোষ, অনিন্দিতা, বটতলার বই ও তার সামাজিক ইতিহাস, বাঙালির বটতলা, পু ৫০
- ৮৬. দাস, সজনীকান্ত, *বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস,* কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ ৩২
- ৮৭. বিশ্বাস, হার্দিকব্রত, পু ২৯৮
- ৮৮. বিশ্বাস, অদ্রীশ (সম্পাদিত), বটতলার বই (১), গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ ৩৩
- ৮৯. মিত্র, হরিশ্চন্দ্র, কৌতুক-শতক, অদ্রীশ বিশ্বাস সম্পাদিত বটতলার বই ১, গাংচিল, পৃ ৭৭
- ৯০. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দুর্গেশনন্দিনী, বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), পৃ ৯
- ৯১. চট্টোপাধ্যায়, জীবানন্দ, বটতলার ভোরবেলা, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৪, পৃ ১৬০
- ৯২. সেন, সুভদ্রকুমার, সুকুমার সেন রচিত বটতলার ছাপা ও ছবি গ্রন্থের নতুন সংস্করণের ভূমিকা অংশ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ ১১-১২
- ৯৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, *কলিকাতা কমলালয়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সংগ্রহ,* (সম্পাদনা রমেনকুমার সর), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ ৩৭
- ৯৪. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, বাংলা ভাষা (১৮৮১), *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ২০০০, কলকাতা, পু ৫৬২
- ৯৫. শ্রীপান্থ, বটতলা, পু ৩১
- ৯৬. ওই, পৃ ৩২
- ৯৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, বাঙালির বটতলা, পৃ ৪২
- ৯৮. বসু, প্রদীপ, *বাঙালির বটতলা,* পৃ ৩১
- ৯৯. বিশ্বাস, হার্দিকব্রত, *বঙ্গসমাজ সংস্কার, 'কালের কুহক' ও বটতলায় ছাপা মেয়েরা, বাঙালির* বটতলা, পৃ ২৯৮
- ১০০. খাস্তগীর, আশিস, বটতলার বইয়ের বাজার, বাঙালির বটতলা, পু ৭০
- ১০১. বিশ্বাস, হার্দিকব্রত, *বঙ্গসমাজ সংস্কার, 'কালের কুহক' ও বটতলায় ছাপা মেয়েরা, বাঙালির* বটতলা, পৃ ৩০১
- ১০২. সেন, সুভদ্রকুমার, সুকুমার সেন রচিত *বটতলার ছাপা ও ছবি* গ্রন্থের নতুন সংস্করণের ভূমিকা অংশ, পৃ ৮
- ১০৩. ওই, পু ৮
- ১০৪. সেন, সুভদ্রকুমার, *উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য : অন্যমুখ, বাঙালির বটতলা,* পৃ ১২৮
- ১০৫. বসু, অমৃতলাল, পুরাতন পঞ্জিকা, ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *রসরাজের রসকথন,* সংবাদ, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ ২৭
- ১০৬. ওই, পৃ ২৮
- ১০৭. সেন, সুভদ্রকুমার, সুকুমার সেন রচিত বটতলার ছাপা ও ছবি গ্রন্থের নতুন সংস্করণের ভূমিকা অংশ, পু ১২
- ১০৮. বিশ্বাস, অদ্রীশ (সম্পাদিত), বউতলার বই (২), গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পু ১০

- ১০৯. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দুর্গেশনন্দিনী, বঙ্কিম রচনাবলী (উপন্যাস সমগ্র), পৃ ২৭
- ১১০. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বড় বাজার, কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী ২, পৃ ১৬০
- ১১১. ন্যায়রত্ন, রামগতি, *বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব*, সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, নতুন সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ ১৪২
- ১১২. বসু, অমৃতলাল, পুরাতন পঞ্জিকা, ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *রসরাজের রসকথন,* পু ২৭
- ১১৩. ঘোষ, বিনয়, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, পৃ ৩৮৬
- ১১৪. বিশ্বাস, অদ্রীশ, কৌতুক শতক বটতলার 'জোক বুক'-এ উনিশ শতকের স্বরূপ নির্ণয়, বাঙালির বটতলা, পৃ ৩৪৮
- ১১৫. ওই, পৃ ৩৪৮
- ১১৬. শ্রীপান্থ, *বটতলা,* পৃ ১৯
- ১১৭. বসু, অমৃতলাল, *পুরাতন পঞ্জিকা,* ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *রসরাজের রসকথন,* পু ২৭
- ১১৮. সেন, সুভদ্রকুমার, সুকুমার সেন রচিত *বটতলার ছাপা ও ছবি* গ্রন্থের নতুন সংস্করণের ভূমিকা অংশ, পু ১১
- ১১৯. সেন, সুকুমার, *বটতলার ছাপা ও ছবি,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ ২৭-২৮
- ১২০. শ্রীপান্থ, *বটতলা,* পৃ ৩৮-৩৯
- ১২১. খাস্তগীর, আশিস, বটতলার বইয়ের বাজার, বাঙালির বটতলা, পু ৬৮
- ১২২. ঘোষ, বিনয়, *বটতলার সাহিত্য,* পৃ ৩৯৩
- ১২৩. ঘোষ, অনিন্দিতা, বটতলার বই ও তার সামাজিক ইতিহাস, বাঙালির বটতলা, পৃ ৬০
- ১২৪. ভদ্র, গৌতম, ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার, ছাতিম বুকস, জানুয়ারি ২০১১, পৃ ২৩৩
- ১২৫. শ্রীপান্থ, বটতলা, পৃ ২২
- ১২৬. বিশ্বাস, অদ্রীশ (সম্পাদিত), ভূমিকা, বটতলার বই ১, গাঙচিল, পৃ ৩৫
- ১২৭. মিত্র, হরিশ্চন্দ্র, কৌতুক-শতক, অদ্রীশ বিশ্বাস সম্পাদিত বটতলার বই ১, গাংচিল, পৃ ৭৬
- ১২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, পৃ ৩৪৩
- ১২৯. মুঙ্গী, আজিমদ্দীন, কি মজার কলের গাড়ি, অদ্রীশ বিশ্বাস সম্পাদিত বটতলার বই ১, পৃ ২৮৩
- ১৩০. ওই, পৃ ২৯০
- ১৩১. বসু, রাজনারায়ণ, আত্মচরিত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৫, পৃ ২৬
- ১৩২. ঠাকুর, টেকচাঁদ (জুনিয়ার), *কলিকাতার নুকোচুরি, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (১),* রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ ২২৪-২২৫
- ১৩৩. মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ, *আপনার মুখ আপুনি দেখ, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (২),* রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ ৩৮
- ১৩৪. বসু, রাজনারায়ণ, সে কাল আর এ কাল, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (৩), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ ১৪৩
- ১৩৫. ঠাকুর, টেকচাঁদ (জুনিয়ার), কলিকাতার নুকোচুরি, পৃ ১৯৯

- ১৩৬. মিত্র, প্যারীচাঁদ, (টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে রচিত), মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (৩), রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পু ১৬৯
- ১৩৭. বিশ্বাস, অদ্রীশ (সম্পাদিত), বটতলার বই (২), গাঙচিল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১, পৃ ২০
- ১৩৮. সাহা, অর্ণব, *ঠিকানা বউতলা,* সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ ৭৫
- ১৩৯. ওই, পু ৭১
- ১৪০. ঘোষাল, চণ্ডিকাপ্রসাদ, *বটতলার 'গুপ্তকথা' : কেচ্ছার ভাঁড়ার না অন্তঃপুরের আরশি, বাঙালির* বটতলা, পৃ ২১৩
- ১৪১. শ্রীপান্থ, বটতলা, পু ৫৩
- ১৪২. ঘোষাল, চণ্ডিকাপ্রসাদ, বটতলার 'গুপ্তকথা' : কেচ্ছার ভাঁড়ার না অন্তঃপুরের আরশি, পু ২১২
- ১৪৩. ওই, পৃ ২১৩
- ১৪৪. সেন, প্যারীমোহন, *রাঁড় ভাঁড় মিথ্যা কথা তিন লয়ে কলকাতা,* অদ্রীশ বিশ্বাস সম্পাদিত বটতলার বই ১, পু ২৭৯
- ১৪৫. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা,* পু ৯০-৯১
- ১৪৬. শিকদার, চন্দ্রকান্ত, *কি মজার শনিবার, বটতলার বই ১,* পৃ ৩১৩
- ১৪৭. শান্যাল, শ্যামাচরণ, *হদ্দ মজা রবিবার, বটতলার বই ১,* পৃ ৩২৭
- ১৪৮. ওই, পৃ ৩৩৮
- ১৪৯. হালদার, রাধাবিনোদ, পাসকরা মাগ, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, কে বি বসাক, ১৮৮৮, পৃ ৩৬২
- ১৫০. ওই
- ১৫১. মুখোপাধ্যায়, ভূদেব, *পারিবারিক প্রবন্ধ*, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, *ভূদেব রচনা সম্ভার*, কলকাতা, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ, পৃ ৪৫৬-৪৯০
- ১৫২. বিশ্বাস, অদ্রীশ (সম্পাদিত), ভূমিকা, *বটতলার বই ১,* গাঙচিল, পৃ ৫২-৫৩
- ১৫৩. মুঙ্গী, নামদার, কাশীতে হয় ভূমিকম্প নারীদের এ কি দম্ভ, বটতলার বই ১, পু ১৮৮-১৮৯
- ১৫৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *বটতলার দোভাষী সাহিত্য---সেকাল ও একাল, বাঙালির বটতলা,* পৃ ১৮০
- ১৫৫. বিশ্বাস, হার্দিকব্রত, *বঙ্গসমাজ সংস্কার, 'কালের কুহক' ও বটতলায় ছাপা মেয়েরা, বাঙালির* বটতলা, প ৩০০
- ১৫৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেব্জিত (সম্পাদিত), *বাই-বারাঙ্গনা গাথা,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৬, পৃ ২৮১
- \$৫৭. Chakravarty, Usha, Condition of Bengali Women around the second half of the nineteeth century, Kalikata, 1963, p.97
- ১৫৮. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা,* পু ১৯৯-২০০
- ১৫৯. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, একেই কি বলে সভ্যতা, সাহিত্য সঙ্গী, এপ্রিল ২০০৯, পৃ ১১৭
- ১৬০. দাসী, বিনোদিনী, *আমার কথা, আমার কথা ও অন্যান্য রচনা,* (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মল আচার্য সম্পাদিত), সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৮৭, পু ৪১
- ১৬১. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, নব বিবি বিলাস, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সংগ্রহ, পৃ ৩১১

- ১৬২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজিত, পু ১৩-১৪
- ১৬৩. বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি, *বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ,* (মৌ ভট্টাচার্য সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর ২০১১, পৃ ৩৩
- ১৬৪. মুখোপাধ্যায়, শ্রী ভুবনচন্দ্র, হরিদাসের গুপ্তকথা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৯৪, পু ৮৫
- ১৬৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ, নব বিবি বিলাস, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সংগ্রহ, পু ৩৩৫
- ১৬৬. মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ, *আপনার মুখ আপুনি দেখ, দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (২),* কলকাতা, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, পু ৫৯
- ১৬৭. তথ্যটি গৃহীত হয়েছে মৌ ভট্টাচার্যের *বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ* (ভূমিকা অংশ), আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১১, কলকাতা, পৃ দশ থেকে।
- ১৬৮. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ শ্রাবণ ১৭৬৮ শক (ইংরেজি ১৮৪৬), ৩৬ সংখ্যা। উদ্ধৃত—বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত) সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ড, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮০, পু১০৬
- ১৬৯. দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ, বদ্মাএস জব্দ, দুম্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ (২), কলকাতা, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, পু ৭
- 590. Chatterjee, Ratnabali, *The Queens Daughters : Prostitutes as an outcast Group in Colonial India,* Occassional paper Chr. Michelsen Institute, Bergen, December 1992, p. 4
- ১৭১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *অশ্রুত কণ্ঠস্বর*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২, পু ১২৮
- ১৭২. ঘোষ, অঘোরচন্দ্র, পাঁচালী কমলকলি, শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলক্যনাথ দে মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে ত্রৈলক্যনাথ দে এন্ড কোং যোড়াবাগানস্থ আনন্দোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা, সন ১২৭৯, পু ৮৬-৮৭
- ১৭৩. ওই, পৃ ৮৭
- ১৭৪. ভট্টাচার্য, মৌ, ভূমিকা অংশ *বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ,* আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ডিসেম্বর ২০১১, কলকাতা, পূ আট-নয়
- ১৭৫. Chatterjee, Ratnabali, *The Queens Daughters : Prostitutes as an outcast Group in Colonial India*, p. 9
- ১৭৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, *অশ্রুত কণ্ঠস্বর,* পৃ ৪১
- ১৭৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস উপনিবেশবাদ ও শিশুসাহিত্য,* (কারিগর সংস্করণের ভূমিকা অংশ) কারিগর, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০১৩
- እዓቴ. Nandy, Ashis, *THE INTIMATE ENEMY Loss and Recovery of Self under Colonialism,* Oxford University Press, 1983, p. 15
- ১৭৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, *শিবাজী, গোপাল রাখাল দ্বন্দ্রসমাস উপনিবেশবাদ ও শিশুসাহিত্য,* পৃ ১৩২
- ১৮০. ওই, পৃ ৫৬
- ১৮১. ভট্টাচার্য তপোধীর, মিশেল ফুকো, তাঁর তত্ত্ববিশ্ব, পৃ ৯২
- ১৮২. বসু, প্রদীপ, বাঙালির বটতলা, পৃ ২০-২১
- ახ©. Nandy, Ashis, *THE INTIMATE ENEMY Loss and Recovery of Self under Colonialism,* p. 16
- ১৮৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস উপনিবেশবাদ ও শিশুসাহিত্য, পু ৫৯

- ১৮৫. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্ৰ, প্ৰাচীনা এবং নবীনা, বিবিধ প্ৰবন্ধ প্ৰথম ভাগ, বঙ্কিম রচনাবলী ২, পু ৫৯০
- ১৮৬. দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, *অ্যান এসে অন দি ইম্পর্টেন্স অফ এডুকেটিং হিন্দু ফিমেলস্, মধুসূদন রচনাবলী*, কলিকাতা ১৯৮৩, পু ৫৫১
- ১৮৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, পৃ ১৯৫
- ১৮৮. ওই, পৃ ১৯৬
- ১৮৯. ঘোষ, বিনয়, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ড, পু ৩৬৩
- ১৯০. Chatterjee, Ratnabali, *The Queens Daughters : Prostitutes as an outcast Group in Colonial India*, p. 2
- ১৯১. ওই, p. 26
- ১৯২. সিংহ, কালীপ্রসন্ন, *হুতোম প্যাঁচার নকশা*, পু ৪৯
- ১৯৩. ওই, পৃ ১৩১
- ১৯৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রামমোহন রায়, চারিত্র্যপূজা, রবীন্দ্র–রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড,* ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সূলভ সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা, আশ্বিন ১৪২২, পু ৭৯৩
- እ৯৫. Trevelyan, George Otto, *The Life and Letters of Lord Macaulay, new edition, vol l,* London 1895, p. 464
- ১৯৬. বসু, স্বপন, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পৃ ৩৭৭
- ১৯৭. চৌধুরী, ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়),* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ২০০৬, পৃ ৪০৯
- ১৯৮. ইয়ং বেঙ্গল ক্ষুদ্র নবাব, অদ্রীশ বিশ্বাস সম্পাদিত বটতলার বই, পু ২৯৮
- ১৯৯. শেঠ, হরিহর, প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়, পৃ ৩৩২
- ২০০. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, কলিকাতা কৌতুকালয়, পৃ ১৩৯-১৪০